প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদস্থ বাংলা বিভাগের অধীনে
পিএইচ ডি ডিগ্রির উদ্দেশ্যে নিবন্ধীকৃত গবেষণা সন্দর্ভ
চূড়ান্তরূপে জমা দেওয়ার পূর্বে উন্মুক্ত আলোচনার জন্য উপস্থাপিত
পাঁচ হাজার শব্দের সংক্ষিপ্তসার

গবেষণার বিষয়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে মহাভারত-চর্চা (১৯৪৭–২০০০)

গবেষক

সঞ্চারী হালদার

পিএইচ ডি রেজিস্ট্রেশন নম্বর : R-19RS102210217

রেজিস্ট্রেশন তারিখ : ২৫/০২/২০২১

External Expert
Departmental PhD Committee
Department of Bengali
Presidency University

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোস্তাক আহমেদ

সহকারী অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

Assistant Professor
Department of Bengali
Presidency University

Convener
Departmental Ph. D Committee
Deptt. of Bengali
Presidency University
Kolkata

Member
Departmental PhD Committee
Department of Bengali
Presidency University

সূচিপত্র

ভূমিকা ৪

প্রথম অধ্যায়

নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, বিনির্মাণ : প্রেক্ষিত মহাভারত ৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহাভারত প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ১২

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে মহাভারতের পুনর্নির্মাণ ১৮

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটোগল্পে মহাভারতের নবায়ন ২৪

পঞ্চম অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে মহাভারত প্রসঙ্গের ব্যঞ্জনাধর্মী উল্লিখন ২৭

উপসংহার ৩১

পরিশিষ্ট ১: গবেষণাপত্রে নির্বাচিত উপন্যাস তালিকা ৩৩

পরিশিষ্ট ২: গবেষণাপত্রে নির্বাচিত ছোটোগল্প ও গল্পগ্রন্থ তালিকা ৩৫

পরিশিষ্ট ৩: গবেষণাপত্রে নির্বাচিত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ তালিকা ৩৭

আকর গ্রন্থপঞ্জি ৪০

সহায়ক বাংলা গ্রন্থপঞ্জি ৪২

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি ৪৮

সহায়ক পত্রিকাপঞ্জি ৫০

সহায়ক অভিধান ৫১

সহায়ক ওয়েবসাইট ৫১

গবেষণাকর্মের অধ্যায়-বিন্যাস

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, বিনির্মাণ : প্রেক্ষিত মহাভারত

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহাভারত প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে মহাভারতের পুনর্নির্মাণ

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটোগল্পে মহাভারতের নবায়ন

পঞ্চম অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে মহাভারত প্রসঙ্গের ব্যঞ্জনাধর্মী উল্লিখন

উপসংহার

ভূমিকা

রামায়ণ-মহাভারত ভারতের জাতীয় জীবনের পরম সম্পদ। এই দুই ধ্রুপদি মহাকাব্য চিরসত্যের আকর; যা ধারণ করে আছে ভারতীয় জাতির সহস্রাধিক বছরের কর্মের ইতিহাস, মর্মের ইতিহাস। সেই কারণে কালকে অতিক্রম করে এই দুই মহাকাব্য প্রশ্নে প্রতিপ্রশ্নে জর্জরিত হয়ে এবং যুগে যুগে বহু সৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয় হয়েও চির প্রাসঙ্গিক হয়ে আছে। মধ্যযুগে কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, কাশীরাম দাস প্রমুখের প্রয়াসে বাংলা ভাষায় মহাভারতচর্চার যে ধারা সূচিত হয়েছিল; আধুনিক যুগেও সেই ধারা অব্যাহত আছে। পাশ্চাত্য প্রভাবে বাঙালির নবজাগরণকালে নতুন করে ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণে সক্রিয় হয় বাঙালি জাতি। আধুনিক লেখক তাঁর কালকে মহাভারতের আলোয় চিনে নিতে চান বা বর্তমানের প্রেক্ষিতে অতীতকে পুনর্বার যাচাই করে নিতে চান। অথবা প্রাচীন মহাকাব্যের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করে নিতে চান নিজস্ব যুগচেতনার দ্বারা। মহাভারতীয় যে সকল চরিত্রের অন্তর্লোক সেভাবে প্রকাশিত হয়নি; তার উপর আলো ফেলেছেন আধুনিক সাহিত্যিক। কথাসাহিত্যের আঙ্গিকে মহাকাব্যিক চরিত্রের মনস্তত্ত্ব এবং তার কার্যাবলির নতুন ব্যাখ্যা এ যুগের পাঠকের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে।

উনিশ শতক থেকে এই একবিংশ শতকের তৃতীয় দশকের সূচনালগ্ন পর্যন্ত বাঙালির মহাভারত-চর্চার ধারাটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ এবং ভাবানুবাদের পাশাপাশি কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, কথাসাহিত্য প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপে মহাভারতীয় অনুষঙ্গ ব্যবহারের বিচিত্র প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। উনিশ শতকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'শর্মিষ্ঠা' নাটক, 'বীরাঙ্গনা' কাব্য, নবীনচন্দ্র সেন রচিত ত্রয়ী মহাকাব্য, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধ প্রভৃতি বাঙালির বিচিত্র ধারায় মহাভারতচর্চার সাক্ষ্য বহন করে। মহাভারতীয় চরিত্রগুলির মর্মকথা উদঘাটনে আগ্রহী হয় আধুনিক বাঙালি। বিংশ শতাব্দীতে বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, প্রমুখ মহাকাব্যের নবতর ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন। কথাসাহিত্যে, নাটকে, কবিতায়, কাব্যনাট্যে মহাভারতের পুনর্নির্মাণ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কালকূট, দীপক চন্দ্র, মহাশ্বেতা দেবী, বাণী বসু, মনোজ মিত্র, শাঁওলী মিত্র প্রমুখ। আবার শিশুসাহিত্যরূপে মহাভারতের নবায়নে গুরুত্ব পায় পাঠক উপযোগী কথনভঙ্গি এবং শিশু মনস্তত্ত্ব। কালের কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচাই করে নেবার জন্যে বাঙালি রামায়ণ, মহাভারতচর্চার থেকে ভালো উপায় আর খুঁজে পায়নি।

বাংলা ভাষায় মহাভারতচর্চার ইতিহাস কম আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। উপন্যাস এবং ছোটোগল্প প্রকরণ দু-টি আধুনিক যুগের ফসল। কাব্য, নাটক, প্রবন্ধে আধুনিক বাঙালি মহাভারতচর্চা ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুরু করলেও ছোটোগল্প বা উপন্যাসে মহাভারত স্থান করে নেয় বিংশ শতাব্দীতে

এসে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মহাভারতের চরিত্র ও ঘটনাবলির মর্মকথা উদঘাটনে আগ্রহী হয় বাঙালি কথাসাহিত্যিক। কথাসাহিত্যের আঙ্গিকে কীভাবে মহাভারতের মতো ক্লাসিক মহাকাব্যের বিষয়বস্তু স্থান করে নিল, কীভাবে উপন্যাসে মহাভারতীয় মিথের নবতর ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হল, কীভাবে ছোটোগল্পের প্লটে মহাভারতের বিভিন্ন প্রসঙ্গ পরিবেশিত হয়ে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করল— এই সবই আমাদের গবেষণায় উঠে এসেছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে মহাভারতচর্চার সামগ্রিক ইতিহাস ও ধারাপ্রবনতা অনুসন্ধানের মাধ্যমে আসলে আধুনিক বাঙালির যুগচেতনা, সাহিত্যবোধ, জাতীয় মানসিকতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য ও ধারাবাহিকতা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যাবে। এই উদ্দেশ্যেই আলোচ্য গবেষণাকর্মের প্রস্তাবনা। ভূমিকা এবং উপসংহার ব্যতীত সমগ্র গবেষণাকর্মটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম **'নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, বিনির্মাণ : প্রেক্ষিত মহাভারত'**। এই অধ্যায়ে মহাভারতের নির্মাণপর্ব ও সময়কাল বর্ণিত হয়েছে। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে লোকসমাজে প্রচলিত ব্যালাড বা বীরগাথা কীভাবে আদি মহাকাব্যের সুসংহত রূপ ধারণ করল তা নিয়ে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বাঙালির মহাভারত-চর্চার সামগ্রিক ধারাটিকে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনটি শ্রেণিতে প্রাথমিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে— ১. অনুবাদ সাহিত্য-চর্চা, ২. মহাভারত-কেন্দ্রিক বিশ্লেষণাত্মক এবং সমালোচনামূলক প্রবন্ধ-চর্চা, ৩. মহাভারত নির্ভর সৃজনী সাহিত্য-চর্চা। বর্তমান গবেষণাপত্রে উপরিউক্ত তৃতীয় ধারাটিতেই মনোনিবেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম **'প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহাভারত প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা'**। এই অধ্যায়ে উনিশ শতক থেকে সৃজনশীল সাহিত্যে মহাভারতচর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়েছে। কাব্য-কবিতা, নাটক, কাব্যনাট্য, ছোটগল্প প্রভৃতি সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি সংরূপেই বাংলা ভাষায় মহাভারতচর্চার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীনতার আগে বাংলা উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে মহাভারতচর্চার কোনো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে মহাভারতীয় বিভিন্ন আখ্যান ও উপাখ্যান যে আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের ভাবনার রসদ যোগাতে শুরু করেছিল; সে বিষয়ে প্রাথমিক ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই অধ্যায় থেকে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম **'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে মহাভারতের পুনর্নির্মাণ'**। ১৯৪৭ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ সময়পর্বে রচিত যে সকল উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় মহাভারত; এই অধ্যায়ে মূল ভাবনা আবর্তিত হয়েছে সেই জাতীয় রচনাগুলিকে কেন্দ্র করে। নির্বাচিত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন বারীন্দ্রনাথ দাশ, প্রমথনাথ বিশী, চিত্ত সিংহ, জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, সমরেশ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শাহ্‌যাদ ফিরদাউস, হর্ষ দত্ত, মিহির সেনগুপ্ত এবং দীপক চন্দ্র। আলোচ্য

উপন্যাসগুলির বিশেষত্ব হল এই জাতীয় উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে লেখকেরা ঘটনা পরম্পরা ও চরিত্রের মর্মকথা বিশ্লেষণে স্বকীয়তার স্বাক্ষর রাখলেও কেউই মহাভারতের মূল কাহিনিক্রমকে বিপর্যস্ত করেননি। সীমার মধ্যে থেকেই মহাভারতীয় কাহিনির আধুনিকীকরণ করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম **'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটোগল্পে মহাভারতের নবায়ন'**। এই অধ্যায়ে মূল বিষয়ভাবনায় আছে সেই ধরনের ছোটোগল্প; যেখানে লেখক মহাভারত উৎস থেকে ঘটনা, চরিত্র সংগ্রহ করে প্রাথমিকভাবে মূলানুগ থেকেও পরিণামে রচনা করেছেন একটি নতুন ও অভিনব গল্প। এই অধ্যায়ে যে সকল লেখকদের ছোটোগল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন সুবোধ ঘোষ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, দীপক চন্দ্র, নবনীতা দেবসেন, মল্লিকা সেনগুপ্ত, সুচিত্রা ভট্টাচার্য। আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে পরশুরাম এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র। পরশুরাম মহাভারতের সারানুবাদ রচনার পাশাপাশি দশটি ছোটোগল্পে মহাভারতের ধ্রুপদি মহিমাকে ক্ষুণ্ন করে লঘু ঘটনার মধ্য দিয়ে হাস্যরস পরিবেশনা করেছেন এবং ব্যঙ্গের কশাঘাতে সমাজচেতনা জাগ্রত করতে চেয়েছেন। গল্পের একেবারে সূচনায় মহাভারতীয় চরিত্র ও প্রেক্ষাপটটুকু বাদ দিলে বাকি গল্পটি এক্ষেত্রে একেবারেই লেখকের নিজস্ব চিন্তার ফসল। প্রেমেন্দ্র মিত্র সেই পথ অনুসরণ করেই ঘনাদা সিরিজের আটটি কাহিনিতে মহাভারত নিয়ে তাঁর নিজস্ব ব্যতিক্রমী চিন্তাভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম **'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে মহাভারত প্রসঙ্গের ব্যঞ্জনাধর্মী উল্লিখন'**। আধুনিক প্রেক্ষাপট ও চরিত্র সমন্বিত যেসব কথাসাহিত্যে মহাভারতীয় মিথের প্রতীকী ব্যবহার বা ব্যঞ্জনাধর্মী উল্লিখন ঘটেছে; সেগুলি এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সভাপর্বে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা, শকুনির কপটতা, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি বিভিন্ন মহাভারতীয় আখ্যান নবভাবনায় ব্যঞ্জিত হয়ে পরিবেশিত হয়েছে আধুনিক কথাকারদের কলমে। এই অধ্যায়ে যাঁদের রচনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তেমন কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক হলেন বনফুল, পূর্ণেন্দু পত্রী, জ্যোৎস্নাময় ঘোষ, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, বাণী বসু প্রমুখ।

প্রথম অধ্যায়

নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, বিনির্মাণ : প্রেক্ষিত মহাভারত

> "ক্লাসিকের রূপ ও ভাব খণ্ডকালের মধ্যে সীমিত নয়। কালোত্তর প্রেরণার শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে আছে কবি বাল্মীকির রামায়ণ ও ব্যাসদেবের মহাভারত। বিশেষ কোনো জাতির জীবনের রীতি-নীতি ও ঘটনা অথবা বিশেষ কোনো যুগের ইতিহাসের উত্থানপতনের ঘটনাকে আশ্রয় করে রচিত হলেও বিশ্বের ক্লাসিক সাহিত্যকীর্তিগুলির মধ্যে মানবজীবনের চিরকালীন আনন্দ, হর্ষ ও বেদনার ব্যাকুলতা বাঙ্‌ময় হয়ে রয়েছে।"[১]

প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে মহর্ষি ব্যাসদেব আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ৪র্থ-২য় শতাব্দীর কোনো এক সময়ে মহাভারত রচনা করেছিলেন। আদি মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য মেনে ব্যাস রচিত মহাভারতের কাঠামোতে পরবর্তীকালে বহু সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, প্রক্ষেপ সাধিত হয়েছে। বর্তমানে মহাভারতের যে বয়ানটি স্বীকৃত তার পর্ব সংখ্যা আঠেরো এবং শ্লোক সংখ্যা এক লক্ষ। মহাভারত হল আদি আকর গ্রন্থ বা ধ্রুপদি বয়ান। আধুনিক সাহিত্যে তার যেকোনোরকম প্রয়োগ হল পুনর্নির্মাণ। এই পুনর্নির্মাণও একধরনের সৃষ্টি বা নবনির্মাণ। স্রষ্টা যখন তাঁর চিন্তাভাবনাকে একটি বিশেষ সংরূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন, তখন সেই টেক্সট বা বয়ান হয়ে ওঠে নবনির্মাণ। নির্মাণের মূল কথা হল সমগ্রতা। সাহিত্যের অন্তর্গত শৈলী, লেখকের জীবনদর্শন, ভাষাবোধ, তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা, কালচেতনা এবং সর্বোপরি পাঠক ও দর্শকের সঙ্গে বয়ানের সংযোগ স্থাপনের সামর্থ্য— এই সব অংশ মিলে একটা সাহিত্য বা শিল্পবস্তু সমগ্র হয়ে ওঠে। আর বিনির্মাণ হল সেই পদ্ধতি যেখানে এই সমগ্র কাঠামোকে বিভিন্ন অংশে ভেঙে ফেলা হয়, যাতে তাদের পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে। বিনির্মাণের লক্ষ্য হল পাঠ্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত দার্শনিক ও ভাষাতত্ত্বগত অনুমান ও সম্ভাবনাকে প্রকাশ করা।

মহাভারতের মুখ্য সংকলক বা স্রষ্টা হিসেবে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নাম উল্লেখ করা হয়। ব্যাসদেবের নির্দেশে স্বয়ং পার্বতীনন্দন গণেশ মহাভারত রচনা করেছিলেন; এমন লোকশ্রুতিও প্রচলিত আছে। তবে সম্পূর্ণত কোনো একক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় মহাভারতের মতো সুবিশাল কাব্য রচনা সম্ভব কিনা এ বিষয়ে পরবর্তীকালে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রামায়ণী কথা'-র ভূমিকায় স্পষ্টতই দাবি করেছেন, মহাকাব্যের আদি কবি বাল্মীকি বা ব্যাস কেউই একক ব্যক্তি ছিলেন না— আসলে তা প্রতীকী গোত্রনাম বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নামকরণ।[২] ব্যাস শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল যিনি বিন্যস্ত করেন; অর্থাৎ এই নামেই শ্রেণিগত পরিচয় প্রচ্ছন্ন রয়েছে। প্রাবন্ধিক, গবেষক তপোধীর ভট্টাচার্যের মতে, মহাভারতের মধ্যে যুগযুগান্তরের ভারতীয় সংস্কৃতি ও মননচর্চার কোশতুল্য সংকলন

ও বিন্যাস করার যে প্রবণতা ও শক্তি ব্যক্ত হয়েছে– আসলে তাকেই ভারতবর্ষ ‘ব্যাস’ অভিধা দিয়ে চিহ্নিত ও সম্মানিত করেছে।

মহাভারতের বিকাশপর্বকে চারটি স্তরে বিন্যস্ত করা যায়। ব্যাসদেবের পূর্বেই লোকসমাজে পাণ্ডববিজয় কথা প্রচলিত ছিল। মনে করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব ৫ম-৪র্থ শতাব্দীর পূর্বেও কুরুবংশের যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা উপকাহিনি দেশের নানা স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিল। প্রথম স্তরের এই ব্যালাড বা বীরগাথা দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হয় বা মহাকাব্যের সুসংহত রূপ ধারণ করে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের হাতে। ব্যাসদেব প্রথম বদরিকা আশ্রমে নিজের পাঁচ শিষ্যকে মহাভারত শুনিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন ব্যাসপুত্র শুকদেব, শিষ্য পৈল, সুমন্ত, জৈমিনি ও বৈশম্পায়ন। ব্যাসদেব যখন তাঁর পাঁচ শিষ্যকে মহাভারত শোনান; তখন এর শ্লোকসংখ্যা ছিল আট হাজার আটশো। তৃতীয় স্তরে বৈশম্পায়ন ভারত সংহিতা বর্ণনা করেছেন জনমেজয় রাজার সর্পসত্রে। তখন মুখ্য আখ্যান কুরু পাণ্ডবের সংগ্রামের সঙ্গে ধর্মনীতি, অর্থনীতির সংযোজনের ফলে মহাভারতের আকার বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। তক্ষশীলায় জনমেজয়ের সর্পসত্রে ব্যাসদেব স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। রাজা জনমেজয় ব্যাসদেবের মুখে পিতৃপুরুষের কীর্তিকাহিনি মহাভারত কথা শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ব্যাসদেবের নির্দেশেই বৈশম্পায়ন প্রতিদিন যজ্ঞশেষে মহাভারত বর্ণনা করেন জনমেজয় ও সর্পসত্রে উপস্থিত অন্যান্য শ্রোতাদের সামনে। এই তৃতীয় স্তরে মহাভারত তথা ‘ভারতসংহিতা’-এর শ্লোকসংখ্যা ছিল চব্বিশ হাজার। উক্ত সর্পযজ্ঞেই শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লোমহর্ষণ-পুত্র পুরাণশাস্ত্রজ্ঞ শ্রুতিধর উগ্রশ্রবা সৌতি। তিনি পরবর্তীকালে নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশ বার্ষিক সত্রে পূর্বশ্রুত বৈশম্পায়ন কথিত ও ব্যাস রচিত মহাভারত শোনান। ততদিনে এই গ্রন্থ লক্ষ শ্লোকের বিশাল আকার ধারণ করেছে।

মহাভারত মূলত তিন শ্রেণির সাহিত্য উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। **১. সৌত বা চারণ সাহিত্য, ২. ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য, ৩. যতি সাহিত্য বা নীতিমূলক শ্রামণ্য রচনা**। প্রথম থেকে দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় অংশটি পরবর্তীকালের রচনা। **মহাভারতের সময়কাল** নিয়ে পণ্ডিতমহলে একাধিক মত প্রচলিত আছে। বাংলা ভাষায় মহাভারতের বৃহত্তম অনুবাদক শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য ভাস্করাচার্যের ‘সিদ্ধান্তশিরোমণি’, মহাকবি কালিদাসের ‘জ্যোতির্বিদাভরণ’, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশির ‘রবিকীর্ত্তি’ নামক শিলালেখ প্রভৃতি থেকে প্রমাণ করেছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল খ্রিঃ পূঃ ৩১০১ অব্দে। কুরুযুদ্ধের ষাট বছর পর অর্থাৎ ৩০৪১ অব্দে মহাভারত রচনা শুরু হয়। মহাভারত রচনা শেষ করতে সময় লেগেছিল তিন বছর।[৩] তবে এই তথ্যপ্রমাণ নিশ্চিতভাবে তাঁরাই স্বীকার করবেন, যারা বিশ্বাস করেন মহাভারত একজন ব্যক্তিরই লেখা। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন, প্রায় এক হাজার

বছর ধরে বিভিন্ন চারণ কবিদের দ্বারা সংযোজন, বিয়োজন, প্রক্ষেপণের ফলে মহাভারতের বর্তমানে প্রচলিত 'শতসাহস্রী সংহিতা'-এর রূপটি গড়ে উঠেছে।

একটি সমগ্র জাতির কল্পসৃষ্টি মহাকাব্য যুগে যুগে নতুনভাবে চর্চিত হয়েছে। যেকোনো প্রাচীন সাহিত্যের অনুবাদ সেই সাহিত্যকে সমকালীন সজীব সাহিত্যের অংশ করে তোলে। মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদক কে, তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক আছে। দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'ভারত পাঞ্চালী' এবং 'সঞ্জয়ের মহাভারত'-কে মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদের মর্যাদা দিতে চান। তবে অধ্যাপক সুকুমার সেন এই দাবি নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছেন, 'সঞ্জয়ের মহাভারত'-এর ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কোনো সংগ্রাহক পৌরাণিক সঞ্জয়ের আড়ালে আত্মগোপন করে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত মহাভারতের কাহিনি একত্র করে জোড়াতাড়া দিয়ে সম্পাদনা করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে এবং ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কবীন্দ্র পরমেশ্বর চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁ-এর নির্দেশে মূল মহাভারতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছিলেন। এই 'পরাগলী মহাভারত'-কেই প্রথম বাংলায় অনূদিত মহাভারতের প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া হয়। এর সামান্য পরবর্তীকালে কবি শ্রীকর নন্দী পরাগল খাঁ-এর পুত্র ছুটি খাঁ-এর নির্দেশে জৈমিনি ভারত অবলম্বনে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করেন। তাঁরা ছাড়াও দ্বিজ অভিরাম, রঘুনাথ, দ্বিজ হরিদাস, ঘনশ্যামদাস, নিত্যানন্দ ঘোষ প্রমুখ মহাভারত অনুবাদ করেছেন। তবে মধ্যযুগে বাঙালি মহাভারত অনুবাদকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন কাশীরাম দাস। সপ্তদশ শতকের সূচনায় বাঙালির স্বভাববৈশিষ্ট্য ও সমাজচেতনাকে মাথায় রেখে মূল মহাকাব্য থেকে গ্রহণ, বর্জন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনার মধ্য দিয়ে মহাভারতের মৌলিক, স্বতন্ত্র পাঠ গড়ে তুলেছিলেন তিনি। আধুনিক যুগে মহাভারত অনুবাদকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজশেখর বসু, শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

রামায়ণ মহাভারতের মতো আদি মহাকাব্যের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে আদি কবির নিরপেক্ষ বর্ণনারীতির ফলে টেক্সটে আছে অজস্র শূন্যস্থান। এর ফলে বিভিন্ন যুগে মহাকাব্যের পাঠে একাধিক অর্থ গড়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাভারতকে কেন্দ্র করে বিশ্লেষণাত্মক এবং সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, সুখময় ভট্টাচার্য, সুকুমারী ভট্টাচার্য, ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শিপ্রা দত্ত, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী প্রমুখ তাঁদের সুচিন্তিত প্রবন্ধগ্রন্থে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মহাভারতের চরিত্র ও ঘটনাবলির ব্যাখ্যা করেছেন। মহাকাব্যে যেসব সম্ভাবনার বীজ সুপ্ত ছিল; সেগুলি ব্যক্ত করেছেন। সময় ও ব্যক্তিভেদে মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা নতুন ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে এইসব প্রবন্ধে। এর ফলে মহাভারত ধর্মগ্রন্থের তকমা পেরিয়ে সাহিত্য, ইতিহাস, বিশেষত ভারতীয় সভ্যতার অভিজ্ঞতার আকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করেছে।

উনিশ শতক থেকে অনুবাদ এবং প্রবন্ধ বাদ দিয়েও নাটক, কাব্য, উপন্যাস, ছোটোগল্প প্রভৃতি সাহিত্যের অপর সৃজনশীল শাখায় মহাভারতের প্রভাব লক্ষ করা যায়। আধুনিক সাহিত্যে মহাভারত-চর্চার দু-টি স্বতন্ত্র ধারাক্রম বর্তমান। এক দল লেখক মহাভারতের কাহিনি ও চরিত্র বিশ্লেষণ করেন আধুনিক দৃষ্টির আলোয়; দ্বিতীয় দল আধুনিক জীবনের অন্তরে সঞ্চারিত করেন মহাভারতীয় ব্যঞ্জনা। গবেষণাপত্রের আলোচ্য বিষয় স্বাধীনতা-উত্তর বিংশ শতাব্দীর বাংলা কথাসাহিত্যে মহাভারত-চর্চা। বাংলা কথাসাহিত্যে মহাভারত-চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তিনটি সুস্পষ্ট ধারাক্রম দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রথম ধারায় মূল কাহিনিসূত্রের কোনো রদবদল না করে কথাসাহিত্যিক ঘটনার নবতর ব্যাখ্যা দেন। পৌরাণিক চরিত্রগুলির মধ্যে সম্ভাবনাগুলি পরিস্ফুট করে আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেন। সমকালীন ভাষায় মহাকাব্য থেকে উপন্যাস ও ছোটোগল্পের বিশেষ সংরূপে মহাভারতের কোনো কাহিনির পুনর্নির্মাণ করেন। এই ধারায় উল্লেখযোগ্য কয়েকজন লেখক হলেন— সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), দীপক চন্দ্র (১৯৩৮-২০১৩), গজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৯০৮-১৯৯৪) প্রমুখ।

দ্বিতীয় ধারায় লেখকগণ মহাভারত উৎস থেকে ঘটনা, চরিত্র সংগ্রহ করে প্রাথমিকভাবে মূলানুগ থেকেও পরিণামে রচনা করেছেন একটি নতুন গল্প। এই গল্পকারেরা মহাভারতের ধ্রুপদি মহিমাকে ক্ষুণ্ন করে কাহিনি বর্ণনায় লঘুতা আনেন। এই জাতীয় কথাসাহিত্যিকদের মূল উদ্দেশ্য হল হাস্যরস পরিবেশনা এবং ব্যঙ্গের সূক্ষ্ম মোচড়ে সামাজিক অসঙ্গতিগুলিকে চিহ্নিত করা। এই ধারায় সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন পরশুরাম (১৮৮০-১৯৬০) ও প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)।

তৃতীয় ধারায় রয়েছে আধুনিক প্রেক্ষাপট ও চরিত্র নিয়ে গড়ে ওঠা সেই জাতীয় গল্প উপন্যাস যেখানে মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা বা চরিত্রের প্রতীকী ব্যবহার বা ব্যঞ্জনাধর্মী উল্লিখন হয়েছে। মহাভারতের অনেক ঘটনা, পরিস্থিতি ও চরিত্রের প্রভাব মানবমনের দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের অতল গভীরে বিরাজমান, তাই কোনো লেখায় এই মহাকাব্যের পরিচিত ঘটনার উল্লিখনে পাঠক সহজে একাত্মবোধ করে। এইসব কথাসাহিত্যের উৎস প্রত্যক্ষভাবে মহাভারত থেকে গৃহীত না হলেও মহাভারতীয় প্রসঙ্গ ও প্রতীক ব্যবহার রচনাটিকে অন্য মাত্রা দান করে। বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯), আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫), মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), পূর্ণেন্দু পত্রী (১৯৩১-১৯৯৭) প্রমুখ অসংখ্য লেখক তাঁদের রচনায় মহাভারতীয় অনুষঙ্গের তাৎপর্যপূর্ণ প্রতীকী ব্যবহার করেছেন।

তথ্যনির্দেশ:

১. সুবোধ ঘোষ, "নতুন করে পাব বলে", 'ভারতপ্রেমকথা', তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, আনন্দ, ১৪২৫, পৃ ১৩

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকায় আদি মহাকাব্যের রচয়িতাদের পরিচয় প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, "বস্তুত ব্যাস বাল্মীকি তো কাহারো নাম ছিল না। ও তো একটা উদ্দেশ্য নামকরণ মাত্র। এত বড়ো বৃহৎ দু'টি গ্রন্থ, আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষ জোড়া দু-টি কাব্য তাহাদের নিজের রচয়িতা কবিদের নাম হারাইয়া বসিয়াছে। কবি আপন কাব্যের এতই অন্তরালে পড়িয়া গিয়াছে।"

দীনেশচন্দ্র সেন, 'রামায়ণী কথা', ৫ম সং, কলকাতা, ভট্টাচার্য এন্ড সন, ১৩৩২, পৃ- রবীন্দ্রনাথ কৃত ভূমিকা অংশ

৩. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, "মহাভারত রচনার সময়", 'মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্ মহাভারতম্–আদিপর্ব্ব: ১', বিশ্ববাণী সং, ৪র্থ মুদ্রণ, কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মাঘ ১৪২৬, পৃ ৪৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মহাভারত প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ— মহাভারত বারংবার বাঙালি সাহিত্যিকদের প্রভাবিত করেছে, প্ররোচিত করেছে নতুন করে লিখতে, নতুন করে ভাবতে। মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ এবং ভাবানুবাদের পাশাপাশি কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, কথাসাহিত্য প্রভৃতি সাহিত্যের বিচিত্র সংরূপে মহাভারতের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক নাটকের উৎসমূলে রয়েছে মহাভারত। **তারাচরণ শিকদার** রচিত **'ভদ্রার্জুন'** (১৮৫২)। এই নাটকের উৎস মহাভারতের আদি পর্বে অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণের আখ্যান। এর পরবর্তীকালে **হরচন্দ্র ঘোষ** (১৮০৮-১৮৬৮) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিশিষ্ট অংশের ভিত্তিতে রচনা করেছেন **'কৌরববিয়োগ'** (১৮৫৭)। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন—

" 'কৌরববিয়োগ' কাশীরাম দাস রচিত মহাভারতের অংশবিশেষের গদ্যরূপ মাত্র, নাটক নহে; ইহাতে ঘটনার বর্ণনাকারী আছে কিন্তু সংঘটনকারী নাই।"[১]

সর্বপ্রথম মহাভারত-আশ্রয়ী সার্থক বাংলা নাটক লেখেন **মাইকেল মধুসূদন দত্ত** (১৮২৪-১৮৭৩)। **'শর্মিষ্ঠা'** (১৮৫৯) নাটকের কাহিনি মহাভারত থেকে গৃহীত হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন সমাজ ও জীবনচেতনা চরিত্রগুলির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। নারী জাগরণের চেতনায় ভাস্বর এই নাটকের চরিত্র দেবযানী। মহাভারতের উপাখ্যান অবলম্বন করে মধুসূদন **'সুভদ্রা নাটক'** (১৮৫৯) নামে আরও একটি রচনা শুরু করেছিলেন। তবে সেই নাটক তিনি শেষ করেননি। মধুসূদনের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নাট্যকার **গিরিশচন্দ্র ঘোষ** (১৮৪৪-১৯১২)। তিনি 'শর্মিষ্ঠা' নাটকটি নৃত্যগীত যুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ যাত্রার রূপ দিয়ে অভিনয় করেছিলেন। যে মহাভারত থেকে তিনি তাঁর নাটকের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন, তা ব্যাসদেব বিরচিত সংস্কৃত মহাভারত নয়; তা বাঙালির নিজস্ব সম্পদ কাশীদাসী মহাভারত। আলোচ্য নাটকগুলি হল **'অভিমন্যু-বধ'** (১৮৮১), **'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'** (১৮৮৩), **'নলদময়ন্তী'** (১৮৮৩), **'বৃষকেতু'** (১৮৮৪), **'জনা'** (১৮৯৪), **'পাণ্ডবগৌরব'** (১৯০০)। প্রতিটি নাটকে কৃষ্ণভক্তির প্রাবল্য লক্ষণীয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাভারতের প্রতিবাদী বলিষ্ঠ নারী চরিত্র দ্রৌপদীর মূল সুরটি ধরতে পেরেছিলেন। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকে পাচকের ছদ্মবেশধারী ভীমকে কীচক বধে উত্তেজিত করার সময় বা ধর্মভীরু যুধিষ্ঠির যাতে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধে পিছপা না হন তারজন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করার সময় দ্রৌপদীর যে মানসিক দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে তা যথার্থ ক্ষত্রিয় বীর রমণীর।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রায় সমসময়ে পৌরাণিক নাটক নিয়ে বাংলা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন **রাজকৃষ্ণ রায়** (১৮৪৯-১৮৯৪)। **‘দুর্বাসার পারণ’**–এর কেন্দ্রীয় ঘটনা বনবাসী যুধিষ্ঠিরের কাছে দুর্বাসা মুনির শিষ্যসহ অতিথি হওয়া। ভক্তিরসের ভারসাম্য স্থির রাখতে না পারলে নাটক যে যাত্রায় পর্যবসিত হয়, তার অন্যতম উদাহরণ রাজকৃষ্ণ রায়ের মহাভারতকেন্দ্রিক নাটক **‘ভীষ্মের শরশয্যা’**। **অমৃতলাল বসুর** (১৮৫৩-১৯২৯) মহাভারতকেন্দ্রিক নাটক **‘যাজ্ঞসেনী’** (১৯১৮) যার মূল প্রতিপাদ্য কৌরব পাণ্ডবদের সংঘর্ষ।

গিরিশ যুগের একেবারে শেষে **দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের** (১৮৬৩-১৯১৩) নাট্যকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে অনুপ্রবেশ। **‘ভীষ্ম’** (১৯১৪) নাটক মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে হলেও রচনায় নিজস্বতার ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন নাট্যকার। আকর-কাহিনির সম্পূর্ণ অনুসরণ না করে তিনি কোনো কোনো স্থলে বিশুদ্ধ কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন বলে নাটকের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। মহাভারতের অতিক্ষুদ্র চরিত্র অম্বাকে তিনি নাট্যঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তী নাট্যকার **ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ** (১৮৬৩-১৯২৭) মহাভারতভিত্তিক নাটকের কেন্দ্রে সঞ্চারিত করেছেন আধুনিক যুগের আত্মসচেতনতা। তাঁর মহাভারতকেন্দ্রিক নাটকগুলি হল **‘বভ্রুবাহন’** (১৩০৬), **‘উলুপী’** (১৩২৩), **‘ভীষ্ম’** (১৩২০), **‘নরনারায়ণ’** (১৩৩৩)। ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘ভীষ্ম’ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ‘ভীষ্ম’-এর মূল পার্থক্য নিহিত আছে আকর গ্রন্থের যথাযথ অনুসরণ বনাম শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে। দ্বিতীয় নাট্যকারের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আদর্শমুখীন ভীষ্ম বারে বারে অম্বার প্রেম প্রত্যাখ্যান করে মহাভারতীয় চরিত্রের মর্যাদা হয়তো রক্ষা করেছেন; কিন্তু এর ফলে তিনি দ্বন্দ্বহীন মানবিক অনুভূতিবঞ্চিত যান্ত্রিক চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। আবার ‘নরনারায়ণ’ নাটকে কর্ণ চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নাটকের চরিত্রগুলি পৌরাণিক প্রসিদ্ধি ত্যাগ করে অনেকাংশে মৌলিকতা অর্জন করতে শুরু করেছিল। অবশ্য এর পূর্বেই **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**(১৮৬১-১৯৪১) কবিতা এবং কাব্যনাট্যে মহাভারতের নবভাষ্য নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলালের দেখানো পথ অনুসরণ করেই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যে সকল নাট্যকার মহাভারতকে তাঁদের রচনার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন; তাঁরা নিজস্ব দর্শন, সমাজচেতনা, কালচেতনা সঞ্চারিত করে দিয়েছেন মহাকাব্যিক চরিত্রগুলির অন্তরে। এই বিষয়ে অগ্রগণ্য নাট্যকার হলেন বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), মনোজ মিত্র (১৯৩৮), শাঁওলী মিত্র (১৯৪৮-২০২২) প্রমুখ। মহাভারতীয় প্রেক্ষাপট ব্যবহার করলেও এই সকল নাটকে উঠে এসেছে সমসময়ের স্বর।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে মহাভারতচর্চার ধারায় যাঁরা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন; তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর লেখা কাব্যনাট্যগুলি হল **‘চিত্রাঙ্গদা’**

(১২৯৮), **‘বিদায় অভিশাপ’** (১৩০১), **‘গান্ধারীর আবেদন’** (১৩০৪), **‘নরকবাস’** (১৩০৪) এবং **‘কর্ণকুন্তীসংবাদ’** (১৩০৬)। প্রতিটি কাব্যই নাটকের সংলাপ আকারে রচিত। মহাভারত নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব চিন্তাভাবনার ফসল আলোচ্য রচনাগুলি। চিত্রাঙ্গদা, কর্ণ, কুন্তী, কচ, দেবযানী, গান্ধারী প্রভৃতি চরিত্রের কার্যকলাপ ও মানসলোক নতুনভাবে পর্যালোচিত হয়েছে রবীন্দ্র-লেখনীতে। চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বই এই সকল রচনার মুখ্য চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। প্রাচীন যুগের চরিত্রগুলির উপর আধুনিক মানুষের জটিলতা, দ্বিধাবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যচেতনা আরোপ করে কবি তাদের যুগভাবনার শরিক করে তুলেছেন।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের বাংলা কাব্যে প্রথম মহাভারত থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন **মাইকেল মধুসূদন দত্ত**। **‘বীরাঙ্গনা’** কাব্যের (১৮৬২) ছয়টি পত্রের উৎস প্রত্যক্ষভাবে মহাভারত। পত্রগুলি যথাক্রমে ‘দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা’, ‘অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী’, ‘দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী’, ‘জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা’, ‘শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী’ এবং ‘নীলধ্বজের প্রতি জনা’। এই কাব্যের গঠনশৈলী অভিনব। পৌরাণিক নায়িকারা তাদের দয়িতের উদ্দেশ্যে লেখা পত্রে মনোভাব প্রকাশে আগাগোড়া কুণ্ঠাহীন, বলিষ্ঠ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশে ভাস্বর ও স্বতঃস্ফূর্ত। সৃজনশীল সাহিত্যে মহাভারতের পুনর্নির্মাণ মধুসূদনের হাত ধরেই সূচিত হয়েছিল।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) তাঁর **‘বৃত্রসংহার’** (১ম খণ্ড: ১৮৭৫, ২য় খণ্ড: ১৮৭৭) কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন মহাভারত থেকে। মহাভারতের বনপর্বে তীর্থযাত্রাপর্বাধ্যায়ে লোমশ মুনি যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে উক্ত উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্যের ধারায় নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) ‘ত্রয়ী’ সর্বশেষ সংযোজন। **‘রৈবতক’** (১৮৮৬), **‘কুরুক্ষেত্র’** (১৮৯৩) এবং **‘প্রভাস’** (১৮৯৬) এই তিনটি কাব্য একত্রে ‘ত্রয়ী’ নামে পরিচিত; যাকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত’ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রথম খণ্ডে অর্জুন-সুভদ্রার বিবাহ, দ্বিতীয় খণ্ডে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যুর শোচনীয় মৃত্যু এবং তৃতীয় খণ্ডে যদুবংশ ধ্বংস এবং শ্রীকৃষ্ণের তনুত্যাগ বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যে হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণকালে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে ধর্ম, রাজ্য ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার বাসনা থাকলেও ভাষার তরল উচ্ছ্বাস এবং ভক্তিরস, গার্হস্থ্যরস ও ভাববিলাসের প্রাবল্যের ফলে মহাকাব্যের দৃঢ়তা ও মূল কল্পনার কেন্দ্রিকতা নষ্ট হয়েছে।

স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে যে সকল কবিরা মহাভারতকে তাঁদের চর্চার কেন্দ্রীয় বিষয় করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই থাকবেন **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**। নাট্যকাব্যগুলি বাদ দিলেও ‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত **‘পুরস্কার’** (১৩ শ্রাবণ, ১৩০০) কবিতায় মহাভারতের কাহিনির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা পাওয়া যায়। মহাভারতে শেষপর্যন্ত যে রাগ-দ্বেষ-হিংসার ঊর্ধ্বে বিপুল বৈরাগ্যের উদাস শান্তির বাণী ধ্বনিত

হয়েছে; সেই সনাতন ভারতীয় আদর্শের কথা এই কবিতায় তুলে ধরেছেন কবি। রবীন্দ্রোত্তর কালে কবিতায় মহাভারত-চর্চা যারা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন **সুধীন্দ্রনাথ দত্ত,** (১৯০১-১৯৬০), **বুদ্ধদেব বসু,** (১৯০৮-১৯৭৪), **বিষ্ণু দে** (১৯০৯-১৯৮২)। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের **'তন্বী'** (১৯৩০), **'অর্কেস্ট্রা'** (১৯৩৫), **'ক্রন্দসী'** (১৯৩৭) এবং **'উত্তর ফাল্গুনী'** (১৯৪০) কাব্যগ্রন্থের উনিশটি কবিতায় প্রসঙ্গক্রমে মহাভারতীয় আখ্যানের বিভিন্ন অংশ চিত্ররূপকল্প হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর মহাভারত কেন্দ্রিক কাব্যনাট্যগুলি বা তাঁর বিখ্যাত কবিতা **'দ্রৌপদীর শাড়ি'** (১৯৪৮) সবই স্বাধীনতা-উত্তর যুগের রচনা। তবে অনিঃশেষ জীবনীশক্তির রূপক হিসেবে প্রথমবার দ্রৌপদীর শাড়ির চিত্রকল্প কবি ব্যবহার করেছিলেন **'বন্দীর বন্দনা'** (১৯৩০) কাব্যগ্রন্থের 'প্রেমিক' কবিতায়। এছাড়া **'দময়ন্তী'** (১৯৪৩) কাব্যের নাম কবিতায় মহাভারতের নল-দময়ন্তী উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণু দের **'চোরাবালি'** (১৯৩৭) কাব্যগ্রন্থের 'ক্রেসিডা' কবিতায় ট্রয় এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সমীকৃত হয়েছে। উক্ত কাব্যেরই 'যযাতি' কবিতায় উত্তরকালকে বঞ্চিত করে বর্তমানের ঋদ্ধি ঘটানোর প্রয়াস প্রতীক আকারে উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়াও মহাভারতের বনপর্বে বকরূপী যক্ষের প্রশ্নের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। **'পূর্বলেখ'** (১৯৪১) কাব্যের 'পদধ্বনি' এবং 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় বিষ্ণু দে মৌষলকাল, অর্জুন, শান্তিপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যুযুৎসু, ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি মহাভারতীয় অনুষঙ্গ উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষত উপন্যাসে মহাভারত চর্চা মূলত শুরু হয় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে। তার আগে **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** রচিত **প্রতিহিংসা'** (আষাঢ় ১৩০২) এবং **'শেষ কথা'** (ফাল্গুন ১৩৪৬), **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের** (১৯১৮-১৯৭০) **'দুঃশাসন'** (১৯৪৫) ও **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের** (১৯০৮-১৯৫৬) **'রাঘব মালাকর'** ও **'দুঃশাসনীয়'** (১৯৪৬) গল্পগুলিতে মহাভারত প্রসঙ্গের উল্লিখন আছে। এছাড়া পরশুরামের দু-টি মহাভারতকেন্দ্রিক ছোটোগল্প **'পুনর্মিলন'** (১৩৩৬) এবং **'তৃতীয় দ্যূতসভা'** (১৩৫০) প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে প্রকাশিত হয়েছিল।

পূর্বোক্ত দু-টি গল্পেই রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে মহাভারতের কচ-দেবযানী উপাখ্যানের অবতারণা করেছেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী এক স্বাধীনচেতা, স্পষ্টবক্তা, আত্মগর্বী নারী। সে নিজের অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করতে জানে, শর্মিষ্ঠার প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে রাজকন্যাকে নিজের দাসী হিসেবে কাজে লাগাতেও পিছপা হয় না। 'প্রতিহিংসা' গল্পের নায়িকা ইন্দ্রাণী প্রভুর গৃহে তীব্র অপমানিত হয়ে প্রসঙ্গক্রমে এই দৃঢ়চেতা, আত্মমর্যাদাসচেতন দেবযানীকেই স্মরণ করেছে।

দ্বিতীয় গল্প 'শেষ কথা'-র নায়িকা অচিরার মুখে পুনরায় উল্লিখিত হয়েছে কচ-দেবযানীর প্রসঙ্গটি। 'বিদায় অভিশাপ'-এ যেখানে দেবযানী কচকে ছাড়তে চায়নি, সেখানে 'শেষ কথা'-র অচিরা নবীনমাধবের বৃহত্তর উন্নতির কথা ভেবে তাকে ধরে রাখেনি। বিদায়কালে কচের প্রতি দেবযানীর

অভিশাপবাক্যটিও সমকালের প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে ভেবে দেখতে বলেছিল অচিরা। কচ তার অর্জিত জ্ঞানসাধনার ধন নিজে ব্যবহার করতে পারত না; কিন্তু অন্যকে দান করতে পারত। কচের মতো অভিশাপগ্রস্ত হলে অধীত বিজ্ঞানের জ্ঞান ইউরোপ অপর দেশকে শেখাতে পারত; কিন্তু নিজেরা তার যথেচ্ছাচারী অপপ্রয়োগ করতে পারত না। এভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দু-টি ছোটোগল্পে মহাভারতের প্রসঙ্গটিকে আবারও একবার নতুন ভাবনায় বিশ্লেষণ করেছেন।

মহাভারতের সারানুবাদ প্রকাশের ছয় বছর আগে বিশ্বভারতী পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'তৃতীয় দ্যূতসভা' (১৩৫০)। এই গল্পের কাহিনি কাল্পনিক। যদিও প্রেক্ষাপট ও চরিত্র মহাভারত থেকেই সংগ্রহ করেছেন গল্পকার। মহাভারতের সভাপর্বে দ্যূতপর্বাধ্যায় ১৫ এবং অনুদ্যূতপর্বাধ্যায় ১৭-তে দু-টি দ্যূতক্রীড়ার বর্ণনা আছে। এই দু-টি পাশাখেলাতেই শকুনি কপটতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ পাণ্ডবদের কপালে জুটেছিল বারো বছরের বনবাস এবং এক বছরের অজ্ঞাতবাস। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের পরিস্থিতি তৈরিই হয়েছিল অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির কর্তৃক স্ত্রীকে বাজি রাখার পর। আলোচ্য গল্পে সেই প্রতারণার পাশাখেলার তৃতীয় পর্যায় নির্মাণ করলেন রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম। তৃতীয় দ্যূতসভার কোনো উল্লেখ মূল মহাভারতে ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে লেখা এই গল্পে মহাভারতীয় কাহিনির রূপকে আসলে আধুনিক রণনীতিকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। আজকের পৃথিবীর শক্তিধর কোনো রাষ্ট্র যেমন অস্ত্র সরবরাহ করে প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধাতে মদত দেয়; ঠিক তেমনিভাবেই এই গল্পে মৎকুনি (শকুনির কাল্পনিক ভ্রাতা) দু-টি কপট পাশা নির্মাণ করে যুধিষ্ঠির ও শকুনিকে ক্রীড়ানকে পরিণত করে। মৎকুনি বলে, "এই তৃতীয় দ্যূতসভায় আমিই উভয় পক্ষ, আপনি আর শকুনি নিমিত্ত মাত্র।"[২]

চল্লিশের দশকে রচিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প তিনটির কেন্দ্রীয় ভাবনায় রয়েছে বস্ত্রসঙ্কটের প্রেক্ষাপট। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বস্ত্র জোগানোর ঘটনাটিকে রূপক হিসেবে গ্রহণ করেছেন উক্ত লেখকেরা। মহাভারতের সভাপর্বে দুঃশাসন স্বহস্তে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করেছিল, আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' গল্পে দেবীদাসের মতো অসৎ ব্যবসায়ীরা পরোক্ষভাবে বাংলার নারীদের বিবস্ত্রা করেছে। তিনি দেখিয়েছেন আধুনিক যুগেও দুরাত্মা দুঃশাসনদের মানসিকতার এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। "সারা পৃথিবী জুড়েই যেন দ্রৌপদীর মতো আর্তনাদ উঠেছে আজকে।"[৩]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে মহাভারতের পুনর্নির্মাণ ও ব্যঞ্জনাধর্মী উল্লিখন যেভাবে বৃদ্ধি পাবে; তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল উনিশ শতকেই। কালের বিচারে আধুনিক সাহিত্য আঙ্গিকে প্রথমে বাংলা নাটক, তারপর কাব্য-কবিতা এবং সবশেষে ছোটোগল্প ও উপন্যাসে মহাভারত স্থান করে নিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড', পঞ্চম সং, কলকাতা, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ, ১৯৬০, পৃ ১০২

২. রাজশেখর বসু, 'পরশুরাম গল্পসমগ্র', নতুন সং, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ২০১০, পৃ ২১৫

৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, "দুঃশাসন", 'গল্পসমগ্র', অখণ্ড সং, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪২০, পৃ ৮৯৫

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে মহাভারতের পুনর্নির্মাণ

সুবোধ ঘোষ রচিত ‘ভারত প্রেমকথা’ গ্রন্থের ভূমিকায় ‘বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিকাল রস’ শীর্ষক প্রবন্ধে সমালোচক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী আধুনিক সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের পুনর্ব্যবহার প্রসঙ্গে দু-টি পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন; যা আধুনিক বাংলা উপন্যাসে মহাভারতের পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। ক্লাসিক বা প্রাচীন সাহিত্য বা সাহিত্যের ধ্রুবপদ অংশে এমন কিছু সর্বজনীনতা আছে, যাতে প্রত্যেক যুগ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই কারণে তাকে “নূতন ভাষ্যে সঞ্জীবিত করিয়া আধুনিক মনের পক্ষে হৃদ্য করিয়া”[১] তোলা হয়। অর্থাৎ কাহিনির কোনোরূপ রদবদল না করে আধুনিক ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়। আরেকভাবে এই পুনর্প্রয়োগ সম্ভব। প্রমথনাথ বিশী লিখছেন—

> “আর এক রকমে প্রাচীন সাহিত্য আধুনিক তৃষ্ণার পানীয় জোগাইতে পারে। নূতন ভাষ্য রচনা করিয়া নয়, নূতন যুগের উপযোগী পরিবর্তন সাধন করিয়া। পৃথিবীর সাহিত্যে সর্বকালেই এমন ঘটিয়াছে, এখনও ঘটিতেছে। ইহাকে বলা যাইতে পারে, প্রাচীনের নবীকরণ।...অনেক লেখক প্রাচীন সাহিত্যের উপরে হস্তক্ষেপ করেন। কাহিনি অংশের অদলবদল করেন, নূতন তথ্য সংযোজিত করেন এবং নূতন ভাষ্যে ও নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত করিয়া তাহাকে নূতন যুগের নাগরিক অধিকার প্রদান করিয়া দূরবর্তী মহত্ত্বকে আধুনিক মনের নিকটে আনিয়া দেন।”[২]

চিত্ত সিংহ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সমরেশ বসু, দীপক চন্দ্র প্রমুখ কথাসাহিত্যিক তাঁদের উপন্যাসে মহাভারতের পুনর্নির্মাণ করতে গিয়ে এই দ্বিতীয় পদ্ধতিই মূলত অবলম্বন করেছেন।

প্রথম যে পুরাণ নির্ভর বাংলা উপন্যাসের খোঁজ পাওয়া যায়, সেটি **দীপক চন্দ্র** রচিত **‘ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ’** (১৯৬১)। দ্বিতীয় পৌরাণিক উপন্যাস **বারীন্দ্রনাথ দাশের ‘শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব’** (১৯৬৮)। মহাভারতের অন্যতম নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ এই দুই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। যদিও দ্বিতীয় উপন্যাসের প্রাথমিক উৎস মহাভারত নয়, ভাগবতপুরাণ। অলৌকিকতাকে বর্জন করে শ্রীকৃষ্ণকে যাদব সমবায় শক্তির শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসেবে অঙ্কন করেছেন লেখক। কোনো ঈশ্বরত্বের আরোপ না করে প্রতিটি ঘটনার লৌকিক যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক। পরবর্তীকালে অনুজ কথাসাহিত্যিক দীপক চন্দ্র পুরাণের নবনির্মাণকালে একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এই উপন্যাসে খ্রিঃপূঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে আভীর, ক্ষুদ্রক, অন্ধক-বৃষ্ণি, মালব প্রভৃতি গণরাজ্য, স্বরাজ্য, ভৌজ্য, সাম্যরাজ্য প্রভৃতি প্রজাতান্ত্রিক জনপদ এবং মগধ, কুরু, পাঞ্চাল প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত ও

রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণের হাতে কংসের নিধন ভারত ব্যাপী ধর্মযুদ্ধের প্রেক্ষাপট রচনা করতে সাহায্য করেছিল।

তৃতীয় যে উপন্যাসে সরাসরি মহাভারত থেকে উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে; সেটি **প্রমথনাথ বিশীর** (১৯০১-১৯৮৫) **'পূর্ণাবতার'** (১৯৭২)। মহাভারতের মৌষল পর্ব থেকে জানা যায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ছত্রিশ বছর পরে পরস্পর আত্মকলহে যদুবংশ ধ্বংস হয়, বলরাম দেহত্যাগ করেন। এমত পটভূমিকায় প্রয়াণকাল আগত হয়েছে এই বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণ যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযম এবং মহাযোগ আশ্রয় করে শয়ান করেছিলেন; তখন মৃগ ভেবে জরা নামে এক ব্যাধ তাঁর পদতল শরবিদ্ধ করে। এই শরাঘাতেই শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছিল। জরাব্যাধ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ হত্যার এই ঘটনা দিয়ে উপন্যাসের সূচনা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা পরবর্তী জরার জীবনের সব ঘটনাই ঔপন্যাসিকের কল্পনাপ্রসূত। ঈশ্বরকে হত্যা করে সে তীব্র অনুশোচনায় দীর্ণ হয়ে পথে পথে পাপ মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করে ফিরেছে। অনুতাপ, আত্মগ্লানি ও আত্মবিশ্লেষণ জরা চরিত্রটিকে আধুনিক করে তুলেছে। প্রভুদয়ালের কাছ থেকে জরা জানতে পেরেছে, পূর্ণাবতারের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই পাপস্খালন সম্ভব। সকল মানুষই পূর্ণাবতারের খণ্ড কলা। কায়মনোবাক্যে পূর্ণতার অভিমুখে যাত্রা করার শাস্ত্রীয় নাম 'পূর্ণাবতার'। অবশেষে জরা বাসুদেবকে যে স্থানে হত্যা করেছিল; সেখানে ফিরে এসে সমুদ্রগর্ভে আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে যন্ত্রণাশুদ্ধ নবজন্মে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মহাভারতের একেবারে শেষ পর্যায়ে উল্লিখিত এক গৌণ চরিত্র জরা ব্যাধ এই উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র। সমালোচক অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় 'কালের প্রতিমা' গ্রন্থে আলোচ্য উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন— "এ যুগের আমরা সবাই জরা— স্বহস্তে আমরা আদর্শকে বাণবিদ্ধ করছি!"[৩] মহাভারতীয় চরিত্রের আধুনিক আঙ্গিকে প্রয়োগ এবং তার আধুনিক ব্যাখ্যা— এভাবেই আধুনিক কথাসাহিত্যের অংশ হয়ে ওঠে প্রাচীন মহাকাব্য।

চিত্ত সিংহ মহাভারতের আদিপর্বের জতুগৃহপর্বাধ্যায়কে অবলম্বন করে রচনা করেছেন **'জতুগৃহ'** (১৯৭৬) উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়ক যুধিষ্ঠির এক সংশয়ব্যাকুল, দ্বিধান্বিত চরিত্র। রাজৈশ্বর্য থেকে, ক্ষমতা দখলের রাজনীতি থেকে যুধিষ্ঠির বারে বারে পালিয়ে যেতে চেয়েছেন, এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত পারেনি। যা অনিবার্য তাকে এড়ানো যায় না। ক্ষমতার মোহপাশ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁকে পাকেচক্রে এমন জড়িয়ে ফেলেছে; যে সজ্ঞানে অন্যায় করতেও আর পিছপা হননি তিনি। দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন, মনোবেদনায় কাতর হয়েছেন কিন্তু তারপরে নিজের, ভ্রাতাদের ও মায়ের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নিরপরাধ পঞ্চপুত্র সহ এক নিষাদ জননীকে জতুগৃহের আগুনে ভস্মীভূতও করেছেন। মাতা কুন্তী প্রশ্ন করলে নিষ্কম্প স্বরে উত্তর দিয়েছেন— "আমাদের বাসনার আগুনে ওঁদের পুড়তেই হবে মা।"[৪]

এই বাসনার নাম জীবনধর্ম। জন্মমুহূর্ত থেকেই মানুষ যে ষড়যন্ত্রের জতুগৃহে বাধ্যত বাস করতে বাধ্য হয়; সেখান থেকে বের করে আনতে পারে এই তীব্র জীবনবাসনা। যদিও তার জন্য অনেক অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে হয়। জতুগৃহ থেকে মুক্তির পরেও পথ থাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন। বস্তুত এই জতুগৃহ ছিল ভয়ংকর ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের প্রথম অঙ্ক। পরিণামে তাই এই উপন্যাসের নায়ক দ্বিধাগ্রস্ত হয়। দ্বন্দ্বই আধুনিক উপন্যাসে চরিত্রের প্রাণ। মহাভারতীয় কাহিনির বীজ নিয়ে চিত্ত সিংহ আসলে আধুনিক মানুষের অস্তিত্বসংকটের ছবি লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন।

মহাভারতকেন্দ্রিক আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস **গজেন্দ্রকুমার মিত্রের** (১৯০৮-১৯৯৪) **'পাঞ্চজন্য'** (১৩৯৪)। ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে পাপীদের বিনাশ ঘটিয়ে ভারতব্যাপী যে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ; তাতে কতটা সফল হয়েছিলেন তিনি? মহাভারতের মূল চালিকা শক্তি শ্রীকৃষ্ণ "সম্ভোগমত্ত মদগর্বিত কলহপরায়ণ মাৎস্যন্যায়ধর্মী নির্বোধ বিকৃত ক্ষাত্রশক্তির দূষিত অধীনতা দূর করে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সৎ মানুষের হাতে দেশের ভার তুলে দিতে"[৫] চেয়েছিলেন। সেই কাজেও বা কতটা সাফল্য পেয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ? এই উপন্যাসে লেখক সেই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করেছেন। কথাসাহিত্যের আঙ্গিকে শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবন ও কর্মপরিকল্পনার পুনর্মূল্যায়ন হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর সখী দ্রৌপদী ও কর্ণের সম্পর্ক নতুন আলোকে বিশ্লেষিত হয়েছে। কৃষ্ণ চরিত্রের গভীর মনোবিশ্লেষণ এই উপন্যাসটিকে আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের শ্রেণিভুক্ত করেছে।

যে দুজন কথাসাহিত্যিকের রচনায় মহাভারতের পুনর্নির্মাণ সর্বাধিক মাত্রায় ঘটেছে, তাঁরা হলেন কালকূট এবং দীপক চন্দ্র। আধুনিক কালের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে **কালকূট** (১৯২৪-১৯৮৮) দেখতে চেয়েছেন ও পাঠককে দেখাতে চেয়েছেন মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রকে। তাঁর মহাভারত-নির্ভর উপন্যাসগুলি হল **'শাম্ব'** (১৯৭৮), **'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি'** (১৯৮৪), **'পৃথা'** (১৯৮৬) এবং **'অন্তিম প্রণয়'** (১৯৮৭)। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব; যিনি যদুবংশ ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ; তাঁকেই কালকূট 'প্রাচীনতম কালের একজন আশ্চর্য প্রতিভাশালী, ত্যাগী, "বিশ্বাসী", উজ্জ্বলতম ব্যক্তিরূপে'[৫] দেখেছেন। মৌষলপর্ব বা যদুবংশ ধ্বংসের সঙ্গে শাম্বের যোগ কতটা ছিল; তা অনুসন্ধানের চেয়ে এই উপন্যাসে লেখক জোর দিয়েছেন এক ব্যক্তির একক সংগ্রামের কাহিনি বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপনের উপর।

অলৌকিকতা যথাসম্ভব পরিহার করে তিনি যুক্তির কোষ্ঠীপাথরে যাচাই করে দেখতে চেয়েছেন প্রতিটি ঘটনা। সেই কারণে 'পৃথা' উপন্যাসে কর্ণকে সূর্যপুত্র হিসেবে না দেখিয়ে দুর্বাসার ঔরসজাত সন্তান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডলের প্রসঙ্গটিও আধুনিক কথাকারের হাতে নতুনভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সামাজিক কারণে কুমারী অবস্থার সন্তানকে ত্যাগ করতে বাধ্য হলেও কুন্তী আগাগোড়া তার খোঁজ রেখেছিলেন। তিনিই পূর্বপরিকল্পনামাফিক সূত অধিরথের ঘরে পুত্রকে পাঠানোর

ব্যবস্থা করেন এবং সঙ্গে দেন প্রাপ্তবয়স্ক হলে চেনার অভিজ্ঞানস্বরূপ কবচকুণ্ডল। শুধু কর্ণ নয়, বিবাহ পরবর্তীকালে কুন্তীর বাকি তিন পুত্রের জন্মরহস্যও নিজের মতো করে উন্মোচিত করেছেন কালকূট। শ্রীমতী ইরাবতী কার্ভের 'যুগান্ত : এণ্ড অফ অ্যান এপিক'-এর দেখানো পথ অনুসরণ করে কালকূট যুধিষ্ঠিরকে বিদুর পুত্র বলে দাবি করেছেন। এছাড়া শতশৃঙ্গ পর্বতের কোনো বলশালী ঋষি ভীমের ও পরশুরামের মতো কোনো অস্ত্রবিদ ঋষির ঔরসে অর্জুনের জন্ম হয়েছিল বলে কালকূট দেখিয়েছেন। বস্তুত পৃথা বা কুন্তী চরিত্রকে সামনে রেখে কালকূট মহাভারতের নবভাষ্য রচনা করেছেন।

'পৃথা'র পূর্ববর্তী উপন্যাস 'অন্তিম প্রণয়'-এ পাণ্ডু ও তাঁর দুই সহধর্মিণী কুন্তী ও মাদ্রীর দাম্পত্যপ্রণয় মূল আলোচ্য বিষয় রূপে উপস্থাপিত হলেও পটভূমি হিসেবে কুরুবংশের পূর্ব ইতিহাস উঠে এসেছে। রাজা পাণ্ডুর দুই স্ত্রীকে নিয়ে হস্তিনাপুর ত্যাগের ঘটনাকে লেখক কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের বীজ বলে মনে করেছেন। নতুন ভাবনার আলোকে তিনি হস্তিনাপুরের সিংহাসনের প্রকৃত দাবিদার নির্বাচনের মূল সমস্যাটিকে চিহ্নিত করতে চাইলেন এইভাবে—

> "পাণ্ডু আর ধৃতরাষ্ট্র যে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসজাত সন্তান তার সাক্ষী ছিলেন স্বয়ং ভীষ্ম, সত্যবতী। এবং সে ঘটনা ঘটেছিল বিচিত্রবীর্যের প্রাসাদেই। পাণ্ডবদের জন্মকালের সাক্ষী কে? বা কারা? এই সন্দেহ হয়েছিল বলেই তো অবিশ্বাস, ঈর্ষা, বিবাদ, ফলতঃ যুদ্ধ।"[৬]

'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অশ্বত্থামা। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকে যে ধর্মযুদ্ধ বলে দাবি করা হয়; তা কতটা ন্যায়সঙ্গত তা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন কালকূট। একাধিক ঘটনাক্রম বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন মহাভারতকার ব্যাস নিজে অস্ত্র না ধরলেও নিরপেক্ষ ছিলেন না। এই একই ভাবনার অনুরণন পাওয়া যায় প্রতিভা বসুর 'মহাভারতের মহারণ্যে' গ্রন্থে। মহাভারতের সৌপ্তিকপর্বে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে ভগ্ন ঊরু লাঞ্ছিত দুর্যোধনের অবস্থা দেখে ক্রোধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন অশ্বত্থামা। তাঁর মনে পড়ে যায় কূট যুদ্ধে পিতা দ্রোণের মৃত্যুর কথা। তিনি পঞ্চপাণ্ডবকে হত্যার সংকল্প করেন কিন্তু ঘটনাচক্রে হত্যা করেন দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে। মহাভারতে অশ্বত্থামা নারকীয় পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের কর্ণধার রূপে স্মরণীয় হয়ে থাকলেও কালকূট তাঁর হৃদয় বেদনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। মহাভারতের অন্যান্য রথীদের তুলনায় পিছনের সারিতে থাকা এই ক্ষত্রিয়বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণকে কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত করলেন।

দীপক চন্দ্রের (১৯৩৮-২০১৩) পনেরোটি উপন্যাসের আখ্যান মহাভারত থেকে গৃহীত। পাণ্ডবরা সততার প্রতিমূর্তি আর কৌরবরা মন্দের আকর— এ জাতীয় ভাবনাবিশ্ব থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর লেখা উপন্যাসগুলির মূল লক্ষ্য ছিল অলৌকিকতা পরিহার করে মহাভারতে বর্ণিত প্রতিটি

ঘটনার বাস্তব, যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান এবং মহাভারতের নিরপেক্ষ বর্ণনারীতির অন্তরালে চরিত্রের যে অন্তর্লোক অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল; তা যথাযথভাবে পাঠকের কাছে উন্মুক্ত করা।

'দ্রৌপদী চিরন্তনী' (১৯৮২) উপন্যাসের ভূমিকায় মহাভারতের পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন লেখক—

> "মহাকবির কোনো সহানুভূতি সমবেদনা পায়নি দ্রৌপদী। তাঁর বিশাল মহাকাব্যে কুরুক্ষেত্রের নায়িকার নিভৃত মনের দুঃসহ অন্তর্জ্বালা ও যন্ত্রণার কোনো হৃদয়গ্রাহী ছবি নেই। সেজন্য অনেক ফাঁক, অনেক ঘাটতি থেকে গেছে দ্রৌপদীর চরিত্রে। দ্রৌপদীকে রক্তমাংসের মানবীতে রূপান্তরিত করার জন্য তার বুকে হৃৎপিণ্ড সংস্থাপন করতে হয়েছে।"[৭]

প্রতিটি উপন্যাসেই দীপক চন্দ্র চরিত্রের আঁতের কথা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। **'কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন'** (১৯৮৬) উপন্যাসে দ্বৈপায়নকেই মহাভারত যুদ্ধের মূল নিয়ন্ত্রা বলে মনে করেছেন। ভীষ্ম-দ্বৈপায়ন দুই ভাইয়ের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আখ্যানই এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য। **'গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী'** (১৯৮৭) এবং **'তোমারই নাম কর্ণ'** (১৯৮৯) উপন্যাসে যথাক্রমে গান্ধারী ও কর্ণ চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে লেখক ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। জতুগৃহ দাহের মন্ত্রণা, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের সময় দ্রৌপদীকে বেশ্যা সম্বোধন— এই বিতর্কিত বিষয় থেকে কর্ণকে মুক্তি দেননি বা এই প্রসঙ্গগুলি এড়িয়ে যাননি। বরং মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কর্ণ চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। **'সম্রাজ্ঞী কুন্তী'** (১৯৯৩) উপন্যাসে জীবনের উপান্তে দাঁড়িয়ে কুন্তী জীবনের স্মৃতিগুলি রোমন্থন করেছেন। সমগ্র ভারত যুদ্ধের জন্য কুন্তী নিজেকে দায়ী করেছেন। তাঁর ক্ষমতালিপ্সা, জেদ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। মহাভারতের এই নব আখ্যান কুন্তীর সম্রাজ্ঞী হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষার আখ্যান। এছাড়া **'পিতামহ ভীষ্ম'** (১৯৮৯), **'মহাভারতের শকুনি'** (১৯৯১) প্রভৃতি উপন্যাসে মহাভারতের নবনির্মাণ জারি থেকেছে।

এই সকল উপন্যাসের বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে দেখা যায় মহাভারতের কাহিনি ও চরিত্র কীভাবে আধুনিক উপন্যাসের অংশ হয়ে উঠল। লেখকের ব্যক্তিগত সমাজবীক্ষা ও জীবনদর্শন মহাভারতের প্রতিটি পুনর্নির্মাণকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যচেতনায় ভাস্বর করে তুলেছে।

তথ্যসূত্র :

১. প্রমথনাথ বিশী, "বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিকাল রস", [ভূমিকা], সুবোধ ঘোষ, 'ভারত প্রেমকথা', ৭ম মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ, ১৪২৫, পৃ অনুল্লিখিত

২. তদেব, পৃ অনুল্লিখিত

৩. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালের প্রতিমা', সংশোধিত ও পরিবর্তিত সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ ২১৯

৪. চিত্ত সিংহ, 'জতুগৃহ', ১ম প্রকাশ, কলকাতা, বিশ্বজ্ঞান, ১৯৭৬, পৃ ১০২

৫. কালকূট, "প্রাক্‌কথন", 'শাম্ব', ১৯শ মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ, ২০২২, পৃ অনুল্লিখিত

৬. কালকূট, "পৃথা", 'কালকূট রচনা সমগ্র', (৬ষ্ঠ খণ্ড), পরিমার্জিত সং, কলকাতা, মৌসুমী প্রকাশনী, ২০১৯, পৃ ৩৮৬

৭. ড. দীপক চন্দ্র, "দ্রৌপদী চিরন্তনী", 'পাঁচটি রাণী কাহিনি', ২য় সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০১৪, পৃ ৩৬

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটোগল্পে মহাভারতের নবায়ন

আধুনিক ছোটোগল্পকার কালের কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচাই করে নেবার জন্যে ফিরে যান তাঁর ঐতিহ্যের কাছে। সমকালের আলোয় চিনে নিতে চান কোনো প্রাচীন সমস্যার মূল সূত্রটিকে, আলোকিত করতে চান কোনো বিশেষ চরিত্রের গূঢ় মনস্তত্ত্ব। মহাকাব্যের বিভিন্ন ঘটনার যুগোপযোগী ব্যাখ্যা তাঁরা ছোটোগল্পের বিশেষ সংরূপে উপস্থাপিত করেন। এভাবে গড়ে ওঠে কথাসাহিত্যের এক বিশেষ ধারা—মহাভারতকেন্দ্রিক ছোটোগল্প-চর্চার ধারা। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে সূচিত হলেও এই ধারা মূলত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। ছোটোগল্পে মহাভারতের নবায়নের ক্ষেত্রে একজন লেখক প্রথমে পাঠক ও পরে নির্মাতার ভূমিকা পালন করে থাকেন। এই অধ্যায়ে তুলনামূলক পদ্ধতিতে বিচার করে দেখা হয়েছে সমকালের আলোয় মহাকাব্যের এই নতুন পাঠ কতটা স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে তার ধ্রুপদি বয়ান থেকে।

রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত সারানুবাদ'। সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি না জানা সাধারণ বাঙালি পাঠক যাতে সহজে মহাভারতের মূল কাহিনির রসাস্বাদন করতে পারে; সে কারণে তাঁর এই মহাকাব্যের সংক্ষেপকরণের কর্মসূচি গ্রহণ। এই অনুবাদ করতে গিয়ে মহাকাব্যের অন্তর্গত কিছু শূন্যস্থান, কিছু চরিত্র তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে পরশুরাম ছদ্মনামে যে গল্পগুলি রচনা করেন; তার পাঁচটির প্রেক্ষাপট প্রত্যক্ষভাবে মহাভারত। এছাড়া আরো পাঁচটি গল্পে মহাভারত প্রসঙ্গের উল্লিখন ঘটেছে। প্রতিটি গল্পের ক্ষেত্রেই তিনি শুরুতে মূলানুগ থেকেছে। ভাষার ভাবগাম্ভীর্য আনুপূর্বিক ঠিক রেখে, মূল কাহিনির নির্দিষ্ট পর্বের প্রত্যক্ষ অনুবাদ করে তিনি প্রথমে যথাসম্ভব মহাকাব্যিক আবহ বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। তারপরেই সচেতনভাবে পরশুরামের কুঠার চালনার মতো সেই আবহ ভেঙে দিয়ে মহাকাব্যিক কাহিনির পরিসর থেকে বেরিয়ে এসে রচনা করেছেন একটি পুরোদস্তুর নতুন গল্প। **'ভীমগীতা'** (১৩৫৭), **'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালি'** (১৩৬০), **'যযাতির জরা'** (১৩৬৪) গল্পে চিরপরিচিত চরিত্রগুলির কর্ম ও ভাবনার নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কাজের পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। **'অদলবদল'** (১৩৬৪) গল্পে কালিদাসের মেঘদূতের যক্ষ এবং মহাভারতের অম্বা-শিখণ্ডী আখ্যানের যক্ষ স্থূলাকর্ণকে একই ব্যক্তি হিসেবে কল্পনা করে অপরূপ কাহিনি সৃজন করেছেন পরশুরাম। মহাভারতীয় প্রেক্ষাপট নিয়ে কাজ করলেও তিনি আসলে ব্যঙ্গের কশাঘাতে বর্তমান সমাজের অসংগতিগুলিকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।

মহাভারতকেন্দ্রিক ছোটোগল্প রচনায় পরশুরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন **প্রেমেন্দ্র মিত্র** (১৯০৪-১৯৮৮)। মহাভারতে যে সকল সম্ভাবনা অস্ফুট ছিল; সেই সব সম্ভাব্য অঘটনকেই নব ভাষায়, কল্পনায় সঞ্জীবিত করেছেন এই দু-জন লেখক। মহাভারত আর ঘনাদার যুগলবন্দিতে মোট আটটি গল্প রচনা করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। গুলবিশারদ ঘনাদা মহাভারতে বর্ণিত বিভিন্ন কাহিনির ত্রুটি খুঁজে বের করে সেগুলির অদ্ভুত হাস্যরসাত্মক কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই গল্পগুলিতে। ঘনাদার মতে, মূল মহাভারতের বহু কাহিনিই নানা কারণে অধুনালুপ্ত। যেমন **'কীচকবধে ঘনাদা'** (১৯৭৬) গল্প থেকে জানা যায়, 'বল্মী-বিশারদ' ফেরিওয়ালার পোষা উইয়ের সাহায্যে মহাভারতের জতুগৃহদাহের সময় পাঁচ পুত্র সহ নিষাদ মায়ের পুড়ে মরার ঘটনাটি বাদ দিতে চেয়েছিলেন নকুল-সহদেব। কিন্তু ভুলক্রমে ভীম-কীচকের যুদ্ধের অংশটি বাদ পড়ে যায়। সেই কারণেই কাহিনিতে গোঁজামিল লক্ষ করা যায়। ঘনাদা তাঁর স্বভাবজাত কল্পনাবলে সেই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করেছেন।

তাঁর গল্পে ব্যবহৃত মহাভারত প্রসঙ্গের উৎস গ্রন্থ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি **'শান্তিপর্বে ঘনাদা'** (১৩৯০) গল্পে উল্লেখ করেছেন— "কাশীরাম দাস, সঞ্জয়, শঙ্কর, শ্রীকর নন্দী, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ঘোষ, পরাগল খাঁর মহাভারতে তো নয়ই, এমনকি ব্যাসদেবের নামে যা চলছে সেই মূল মহাভারতেও না।"[১] তিনি সেই না জানা কাহিনিই মেসের শ্রোতাদের শুনিয়েছেন। যদিও সেই তথাকথিত 'মূল মহাভারত'-টি ঘনাদা কোথায় পেলেন; সে বিষয়ে তিনি যথারীতি নীরবতা অবলম্বন করেছেন। ঘনাদার সব ব্যাখ্যাই কল্পিত বা অতিরঞ্জিত বলে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। যেমন **'জয়দ্রথ বধে ঘনাদা'** (১৩৯৫) গল্পে ক্ষণকালের জন্য সুদর্শন চক্রের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সূর্যকে আবৃত করার ঘটনাটিকে ঘনাদা পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এবং সেই সূত্র ধরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রকৃত সময়কাল নির্ণয় করা সম্ভব বলে তিনি উল্লেখ করেন। ঘনাদার গল্প ছাড়াও **'মহাভারতে নেই'** (১৩৮০) বলে একটি ছোটোগল্প সংকলন প্রকাশ করেছিলেন লেখক। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মহাভারতীয় অনুধ্যান, স্বকীয় বিশ্লেষণ এবং কল্পনার সাক্ষ্য আলোচ্য রচনাগুলি।

পরশুরাম, প্রেমেন্দ্র মিত্রের থেকে আবার একেবারেই ভিন্ন পথের পথিক **সুবোধ ঘোষ** (১৯০৯-১৯৮০) এবং **গজেন্দ্রকুমার মিত্র** (১৯০৮-১৯৯৪)। এই দুজন গল্পকার মূল আখ্যানকে অতিক্রম না করেই নবভাষ্য রচনা করার সময় স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। **'ভারত প্রেমকথা'** গ্রন্থের (১৩৬২) কুড়িটি গল্পে সুবোধ ঘোষ মহাভারত থেকে এমন কুড়িটি কাহিনি বেছে নিয়েছেন; যেগুলি অন্তরে আধুনিক কিন্তু আবেদন চিরকালীন। প্রমথনাথ বিশী গ্রন্থের ভূমিকায় এই রচনার বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করছেন—

“কাহিনিগুলি কেবল ভাবের বাহন মাত্র নয়, নিজ মূর্তিতে সমুজ্জ্বল ও নিজ প্রাণে সঞ্জীবিত। প্রাচীন কাহিনির আধারে সুবোধবাবু চিরকালীন সুখ-দুঃখের ও হাসি-অশ্রুর অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন। এগুলি জ্ঞানের বস্তু নয়, জীবনের সামগ্রী।”[২]

সুবোধ ঘোষ ‘ভারত প্রেমকথা’-র গল্পগুলিতে মহাভারতীয় চরিত্রগুলিকে রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত অনুভূতি, কামনা-বাসনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, উপলব্ধি প্রকাশের মাধ্যমে আধুনিক চরিত্র হয়ে উঠেছে। গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচিত ‘যাজ্ঞসেনী’, ‘হোমাগ্নিসম্ভবা’, ‘জরা বাসুদেব’ (১৩৭৯) প্রভৃতি গল্পেরও মূল বৈশিষ্ট্য এই মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা। দীপক চন্দ্রের ছোটোগল্পগুলিতে আবার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে একলব্যের মতো নিম্নবর্গের মানুষের সুখ-দুঃখের আখ্যান। ‘যোজনগন্ধা সত্যবতী’-র (১৯৬১) আখ্যানে ধরা পড়েছে কৃষ্ণবর্ণ মানুষদের উত্থান ও ক্ষমতাদখলের ইতিবৃত্ত। মহাভারত-চর্চার প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির থেকে কিছুটা সরে এসেই অবস্থান করে দীপক চন্দ্রের লেখনী।

এভাবে স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে বাংলা ছোটোগল্পে মহাভারতের নবায়ন জারি থাকে। বুদ্ধদেব বসুর অনুসরণে বলা যায়, কালকে অতিক্রম করে মহাভারতের বিভিন্ন আখ্যান ও উপাখ্যান একই বীজ থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে ভৌগোলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে বহু বিভিন্ন ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে।

তথ্যসূত্র:

১. প্রেমেন্দ্র মিত্র, “শান্তিপর্বে ঘনাদা”, ‘ঘনাদাসমগ্র ২’, ৯ম মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ, অক্টোবর ২০১৭, পৃ ২৭৫

২. প্রমথনাথ বিশী, “বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিকাল রস”, [ভূমিকা], সুবোধ ঘোষ, ‘ভারত প্রেমকথা’, ৭ম মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ, ১৪২৫, পৃ অনুল্লিখিত

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে মহাভারত প্রসঙ্গের ব্যঞ্জনাধর্মী উল্লিখন

মহাভারতের নানান ঘটনা, পরিস্থিতি ও চরিত্রের প্রভাব মানবমনের দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের অতল গভীরে বিরাজমান; তাই আধুনিক কোনো রচনায় এই মহাকাব্যের পরিচিত ঘটনার উল্লিখনে পাঠক সহজে একাত্মবোধ করে। একালের গল্পকারেরা বহু ছোটোগল্পেই মহাভারতীয় মিথের প্রতীকী ব্যবহার করেছেন। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর চিরকালীন নিপীড়িত ও অত্যাচারিত হওয়া, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা এবং সেই সূত্রে অন্যায় জেনেও অধার্মিক পক্ষকে সমর্থন করার অসহায়তা, যোগ্য হয়েও কানীনপুত্র কর্ণের বঞ্চনা ও ভাগ্য বিড়ম্বনা, কুমারী মাতা হিসেবে কুন্তীর মনস্তত্ত্ব, যযাতির উত্তরকালকে বঞ্চিত করে আত্মসুখে নিমগ্ন হওয়া, যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা, চক্রব্যূহে নিকটাত্মীয়দের হাতে কিশোর অভিমন্যুর অকালমৃত্যু প্রভৃতি মহাভারতীয় চরিত্র এবং প্রসঙ্গ আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের বারংবার ভাবনার রসদ জুগিয়েছে। এই মহাভারতীয় উপাদানগুলির পুনর্ব্যবহার করে আধুনিক লেখকগণ নিজস্ব শৈলী ও জীবনবীক্ষার প্রয়োগে গড়ে তুলেছেন স্বতন্ত্র গল্প এবং উপন্যাস। আসলে আমাদের চারপাশের চেনা সমাজ, চেনা মানুষজনকে আরেকটু নিবিড়ভাবে আঁকতে চেয়ে লেখকেরা মহাভারতের প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। বাঙালি মননে মহাভারতের প্রভাব এত গভীর যে, এই সব প্রসঙ্গের উল্লেখ বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করে।

বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত যে সব ছোটোগল্পে ভীষ্ম প্রসঙ্গের ব্যঞ্জনাধর্মী উল্লিখন ঘটেছে, সেগুলি হল **বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের** (১৮৯৯-১৯৭৯) **'শরশয্যা'**, **আশাপূর্ণা দেবীর** (১৯০৯-১৯৯৫) **'ভীষ্ম'** এবং **মহাশ্বেতা দেবীর** (১৯২৬-২০১৬) **'ভীষ্মের পিপাসা'**। আধুনিক কোনো গল্পে যখন একজন সৎ আদর্শবান ব্যক্তি পরিস্থিতির ফেরে পড়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে পিছিয়ে আসেন, তখন ভীষ্ম প্রসঙ্গের ব্যঞ্জনাধর্মী উল্লিখন করেন গল্পকার। মহাভারতে দেখা যায় আজীবন ধর্মপথে থাকার পরেও পরিস্থিতির কারণে ভীষ্মকে অনেকক্ষেত্রে অন্যায়কে নীরবে মেনে নিতে হয়েছিল। সেই যুগে সাহিত্য ও সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ সেভাবে ঘটেনি। সাধারণভাবে রাজপরিবারের অংশ হিসেবে তারই কোনো সদস্যের বিরুদ্ধাচারণ করা যেত না; কারণ তা হত রাজশক্তির পরিপন্থী। সেই কারণে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পর্বে তাঁকে নীরব থাকতে হয়েছে। আবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় কামনা করেও তাঁকে কৌরবপক্ষের নেতৃত্ব দিতে হয়েছে। এইরকম পরিস্থিতিগুলোয় ভীষ্মের মানসিক দ্বন্দ্বের ছবিটি কেমন ছিল তা স্পষ্ট করেননি মহাকাব্যকার। আর ভীষ্ম চরিত্রের সেই মনস্তাত্ত্বিক অসহায়তাকেই বনফুল, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ কথাসাহিত্যিক তাঁদের রচনায় তুলে ধরেছেন। আবার মহাশ্বেতা দেবী চিহ্নিত

করেছেন আধুনিক যুগের ভীষ্মের সঙ্গে পৌরাণিক যুগের ভীষ্মের পার্থক্যের সূচকটিকে। মহাভারতে শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্মের জলপানের অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করেছিলেন অর্জুন। কিন্তু আলোচ্য ছোটোগল্পে ভীষ্ম গরান পিপাসার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

কথাসাহিত্যে দ্রৌপদী চরিত্রের ব্যঞ্জনাধর্মী উল্লিখন প্রসঙ্গে বলা যায় সৌন্দর্যে, বীর্যে, মেধায়, মননে অসামান্যা, অনন্যা ক্ষত্রিয় রমণী, পঞ্চপাণ্ডবের সহধর্মিণী যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী সেই মহাভারতের যুগ থেকে একুশ শতক পর্যন্ত আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছেন। আধুনিক গল্পকার যখন সমসময়ের গল্প বলতে গিয়ে দ্রৌপদীর মিথকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করেন; তখন এই মহাভারতীয় চরিত্রের দু-টি দিক মূলত নতুনভাবে পুনর্ব্যাখ্যাত হয়। প্রথমত, দ্রৌপদী অত্যন্ত বলিষ্ঠ একজন নারী, নিজে স্বাধীন মতপ্রকাশে সক্ষম এবং কোনো ব্যাপারেই পরমুখাপেক্ষী নন। অতি গুণবান, বীর্যবান পঞ্চস্বামীর তিনি সুযোগ্য সহধর্মিণী। দ্বিতীয়ত, এত তেজোদীপ্ত নারী হওয়া সত্ত্বেও ক্ষেত্রবিশেষে অসহায়, পুরুষের নির্লজ্জ কামনার চিরন্তন শিকার। তাঁর চরিত্র ও জীবনকাহিনির এই অভিনবত্বই বারে বারে আধুনিক কথাসাহিত্যিককে প্রণোদিত করেছে তুলনা-প্রতিতুলনার। ক্ষমতাশীল পুরুষের হাতে নারী নিপীড়নের ছবি আঁকতে গেলে আধুনিক লেখকেরা বারংবার দ্রৌপদীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন।

কৌরব রাজসভায় দুঃশাসনের হাতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ছিল আসলে রাজশক্তি তথা পুরুষতন্ত্রের হাতে নারীর লাঞ্ছনা এবং তারপর এক অত্যাচারিতা নারীর একক প্রতিবাদ সমগ্র পুরুষ জাতির প্রতি। দ্রৌপদী চরিত্রের প্রতিবাদী ভাবমূর্তিকে সামনে রেখে **মহাশ্বেতা দেবী** (১৯২৬-২০১৬) আধুনিক যুগের একজন প্রতিবাদে দৃপ্ত বলিষ্ঠ নারীচরিত্র অঙ্কন করেছেন তাঁর **'দ্রৌপদী'** (১৯৭৭) গল্পে। প্রকৃতপক্ষে মহাভারতের দ্রৌপদীর মিথকে ব্যবহার করে বর্তমান সমাজের নগ্নরূপকে তুলে ধরবার উদ্দেশ্যেই গল্পের মুখ্য চরিত্র সাঁওতাল হলেও তার নাম রেখেছেন দ্রৌপদী মেঝেন। মহাভারতের সভাপর্বে দেখা যায়, পঞ্চস্বামী এবং সভাস্থ কুরুপ্রধানগণ নীরব থাকলেও শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানের ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে দ্রৌপদীর মতো নিম্নবর্গীয় নারীকে রক্ষা করার জন্য কেউ থাকে না। নগ্নতাই দ্রৌপদীর প্রতিবাদের অস্ত্র হয়ে ওঠে। গল্পের শেষে দ্রৌপদী কাপড় পরতে অস্বীকার করে। উন্মুক্ত শরীরে সে আহ্বান জানায় রাষ্ট্রশক্তিকে, রাষ্ট্রের লালসাসিক্ত গনগনে পৌরুষকে।

আবার **'খাড়ুবেড়িয়ার দ্রৌপদী'** (১৯৯৮) গল্পে **পূর্ণেন্দু পত্রী** (১৯৩১-১৯৯৭) আলো ফেলতে চেয়েছেন সনকা মাহাতোর মতো অসংখ্য 'আজকের ভারতের দ্রৌপদী'র উপর, "যারা লড়ছে, মরছে, গড়ছে, ভাঙছে, পুড়ছে, জ্বলছে"[১]। সেই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে কলকাতায় সোমনাথ হোড়ের ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য প্রদর্শনীর কথা, যার প্রধান চরিত্র ছিল দ্রৌপদী। শিল্পী সেখানে এই যুগের নারীর মধ্যেই খুঁজে ফিরেছেন তেজোদীপ্তা অগ্নিসম্ভূতাকে। আবার **জ্যোৎস্নাময় ঘোষ** (১৯৩৬-২০০৮) রচিত **'অক্ষক্রীড়ার**

ক্যাবিনেট মিশন ও ভাঙা বাংলার বুলা' (১৯৮১) গল্পে মহাভারতের দ্রৌপদীর দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিল ভাঙা বাংলার বুলার উপর। দেশভাগের 'কোল্যাটেরাল ড্যামেজ' হিসেবে দুই বাংলার হাজার হাজার মেয়ে যে নারকীয় অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছিল; ভাঙা বাংলার বুলা ছিল তাদেরই এক প্রতিনিধি। উত্তরপ্রদেশের উদ্বাস্তু মুসলমান রমজান যখন দুঃশাসনের মতো বুলার বস্ত্রহরণ করতে মত্ত হয়ে উঠেছিল, তখন যুগের ধর্ম মেনে বুলার প্রেমিক চন্দন কাপুরুষের মতো পালিয়ে গিয়েছিল। তার 'সুগোল পৌরাণিক বাহু, বিস্তৃত বক্ষপট তলপেট শাল বৃক্ষের উরু' কিছুই ঢাল হয়ে দাঁড়ায়নি। বুলাকে ট্রেনে করে এপারে পৌঁছে দেওয়ার সময় ফিরোজের অমোঘ উচ্চারণে রচিত হয়েছে মহাভারতের নবভাষ্য—

> "... পাশা খেলায় দ্রৌপদীকে যখন বাজি ধরা হয়, দ্রৌপদী তা জানতেন না। কিন্তু জুয়াড়ী স্বামীর প্রলোভনের পরিণতি থেকে তিনি রেহাই পাননি। উপ-মহাদেশ সদৃশ আমাদের এই ভারতবর্ষে তেমনি এক রাজনৈতিক জুয়াখেলায় আমাদের অজ্ঞাতেই আমাদের বাজি ধরেছিলেন কিছু ক্লান্ত আর ফুরিয়ে যাওয়া নেতা। দেশটা ভাগ হয়ে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও।"[২]

অর্থাৎ দ্রৌপদীর দুর্ভাগ্যের ভাগীদার শুধু বুলা একা নয়। দ্রৌপদীর ভাগ্য বিপর্যয় যেমন এক ভ্রাতৃঘাতী রক্তক্ষয়ী মহাসংগ্রামের জন্ম দিয়েছিল, এক টুকরো পৃথক ভূমির জন্যে দেশ জুড়ে মৃত্যুমিছিল নেমেছিল; বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সেই একই জমির জন্য লড়াই, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ এবং নারীর চূড়ান্ত অবমাননা। জুয়াখেলায় হেরে পাণ্ডবদের দ্রৌপদীসহ বনবাসে যেতে হয়েছিল। কিন্তু এখানে বুলার নিজদেশে একাকী স্বেচ্ছা নির্বাসন।

দ্রৌপদী প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে, এই অধ্যায়ে আলোচিত এমন অন্য গল্পগুলি হল **বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের** (১৯৩০-২০০১) **'বস্ত্রহরণ'**, **'দ্রৌপদী'** এবং **বাণী বসুর** (১৯৩৯) **'পাঞ্চজন্য'**। **জ্যোতির্ময়ী দেবীর** (১৮৯৬-১৯৮৮) **'কর্ণ-কুন্তী কথা'**, **অমলেন্দু চক্রবর্তীর** (১৯৩৪-২০০৯) **'অধিরথ সূতপুত্র'**, **সুবোধ ঘোষের** (১৯০৯-১৯৮০) **'কৌন্তেয়'** এবং **সমরেশ বসুর** (১৯২৪-১৯৮৮) **'কুন্তী সংবাদ'**— এই চারটি গল্পের বিষয়ভাবনা আবর্তিত হয়েছে মহাভারতের কুন্তী এবং কর্ণকে কেন্দ্র করে। যুধিষ্ঠির প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে **বিমল করের** (১৯২১-২০০৩) **'সত্যদাস'** ও **'যুধিষ্ঠিরের আয়না'** গল্পদু-টি। এখানে যুধিষ্ঠিরের ভূমিকা অনেকাংশে যাত্রার বিবেকের মতো। যযাতি চরিত্রের ব্যঞ্জনাধর্মী উল্লিখন প্রসঙ্গে নির্বাচিত রচনাগুলি হল **আশুতোষ মুখোপাধ্যায়** (১৯২০-১৯৮৯), **নরেন্দ্রনাথ মিত্র** (১৯১৬-১৯৭৫) এবং **রতন ভট্টাচার্য** (১৯৩৩-২০০৬) রচিত **'যযাতি'** নামাঙ্কিত তিনটি গল্প।

বাংলা কথাসাহিত্যে মহাভারতের বিভিন্ন প্রসঙ্গগুলির ব্যঞ্জনাধর্মী উল্লিখনের মাধ্যমে বর্তমান খণ্ডিত কালটিকে যেমন সুস্পষ্টভাবে চেনা যায়, তেমনি বাঙালির ভাবজগতে মহাভারতের প্রভাব কতোটা

সুদূরপ্রসারী তা উপলব্দি করা যায়। লেখকেরা তাঁদের রচনায় পৌরাণিক সময় ও বর্তমান সময়কে মিলিয়ে দেন। পুরাণের পরিচিত চরিত্র বা ঘটনার উল্লেখে পাঠকের রক্তের মধ্যে ঝংকার ওঠে, সহজেই অভিঘাত সৃষ্টি হয়। আজন্মলালিত সংস্কার ও মহাকাব্যিক যূথচেতনা থেকে পাঠক সহজে এই জাতীয় কথাসাহিত্যের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. পূর্ণেন্দু পত্রী, “খাড়ুবেড়িয়ার দ্রৌপদী”, ‘একালের গল্প’, ১ম প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ রাজ্য কমিটি, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ ৫৩

২. জ্যোৎস্নাময় ঘোষ, “অক্ষক্রীড়ার ক্যাবিনেট মিশন ও ভাঙা বাংলার বুলা”, ‘জ্যোৎস্নাময় ঘোষের রচনাসমগ্র প্রথম খণ্ড’, ১ম প্রকাশ, কলকাতা, কালধ্বনি, জানুয়ারি ২০১০, পৃ ২০৩

উপসংহার

প্রত্যেক যুগে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও মতাদর্শ থেকে মহাভারত-চর্চা করেছেন। তাঁদের কেউ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মহাকাব্যের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করতে পেরেছেন, মহাভারতের নব আলেখ্য রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন; কেউ বা শুধুমাত্র অতীতচারণেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে যে সমাজব্যবস্থা বা মানসিকতা তথা রাজনৈতিক চেতনা, ধর্মীয় সংস্কার থেকে মহাভারতের মতো টেক্সট গড়ে উঠেছিল; বর্তমানে তার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। ধর্মগ্রন্থের বদলে সমাজ অভিজ্ঞতার আকরগ্রন্থ হিসেবে মহাভারতকে বিচার করতে চায় আধুনিক বাঙালি। এইভাবেই এক যুগ থেকে আরেক যুগে মহাভারতের পুনর্নির্মাণ-বিনির্মাণ-নবনির্মাণ জারি থাকে।

আসলে রামায়ণ, মহাভারতের মতো 'epic of growth', যেখানে দুই পংক্তির মাঝে থাকে অজস্র শূন্যস্থান; সেখানেই আধুনিক সাহিত্যিক সুযোগ পেয়ে যান নিজের মতো করে সাজিয়ে নেওয়ার। লেখকদের সমাজ ও মানুষকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি রাজনৈতিক অবস্থান এবং লিখনশৈলী বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়াতেও বদল আসতে থাকে। মহাভারতে যা ইঙ্গিতমাত্র ছিল, বা যে সম্ভাবনা অস্ফূট ছিল, তাকেই নবজীবন দেন আধুনিক লেখক। মহাকাব্যিক চরিত্রের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়।

বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে পাঁচটি অধ্যায় জুড়ে স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে বাংলা কথাসাহিত্যে মহাভারত-চর্চার সমৃদ্ধিশালী ধারাটি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। মহাভারতের বিভিন্ন মিথ আধুনিক বাঙালি মানসে কীভাবে আজও ক্রিয়াশীল এবং সাহিত্যে তা কোন নতুন মাত্রা যোগ করেছে তার খোঁজ করা হয়েছে। মূলত মহাভারতকেন্দ্রিক উপন্যাস ও ছোটোগল্পগুলি আলোচনায় উঠে এলেও নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি অন্যান্য সংরূপেও বাঙালির মহাভারত-চর্চার পরিসরটি আলোচনায় ব্রাত্য থাকেনি। বর্তমান সমাজ-রাজনীতি, আধুনিক মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিসংকট কীভাবে মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সমীকৃত হয়ে গেছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। উপন্যাস ও ছোটোগল্পগুলি রচনার সময় মূল মহাভারত থেকে কতটা সরে এসেছেন আধুনিক লেখক; সেই স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করা হয়েছে। তিনটি স্বতন্ত্র ধারায় মহাভারত-চর্চার সামগ্রিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে বাংলা কথাসাহিত্যে মহাভারতীয় ঐতিহ্যের প্রবহমানতা অনুসন্ধান করা হয়েছে।

কথাসাহিত্যিকগণ তাঁদের সময়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের যাপিত সময়কে পাঠকের সামনে আরও স্পষ্ট করে উপস্থাপিত করার জন্য মহাকাব্যিক অনুষঙ্গ টেনে এনে অদ্ভুত সময়ের দলিল তৈরি করেন। দেশভাগের আখ্যানে মহাভারতের জমির জন্য লড়াই জুড়ে যায়। নারী যতবার অসম্মানিত, অপমানিত

হয়; দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গ ফিরে আসে। যোগ্য ব্যক্তি তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হলে উল্লিখিত হয় কর্ণ প্রসঙ্গ। কোনো ব্যক্তি পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হলে মানুষ স্মরণ করে কৌরব সেনাপতি হিসেবে পিতামহ ভীষ্মের অসহায়তাকে। আবার উল্টোদিকে মহাভারতের পুনর্নির্মাণ ঘটেছে যে সব গল্প-উপন্যাসে, সেখানে মহাকাব্যিক চরিত্র ও কাহিনিতে আধুনিক মানুষের মানসিকতা, দ্বন্দ্ব, বেদনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যচেতনা সঞ্চারিত হয়েছে। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের অন্তরালে অথবা মহাকাব্যের বিস্তৃত পরিসরে মূল কাহিনির অন্তরালে যেসব ছোটো ছোটো ঘটনা বা চরিত্র তাদের অসীম সম্ভাবনা নিয়ে ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠেই আবার মিলিয়ে গেছে; তাদেরকেই কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছেন আধুনিক লেখক। কোনো পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার সময় পালটে দিয়েছেন চিরাচরিত দৃষ্টিকোণ। ফলত প্রেক্ষাপট প্রাচীন হলেও কথাসাহিত্যটি হয়ে উঠেছে আধুনিক চেতনায় ভাস্বর।

আশা করছি, বর্তমান গবেষণা নিবন্ধটি পাঠ করে উৎসাহী পাঠক একটা ধারণা করতে পারবেন যে, বাঙালির বাঙালির সমাজচেতনায়, ইতিহাস চেতনায়, জাতীয় রাজনৈতিক চেতনায় মহাভারত কীভাবে আজও গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক হয়ে আছে। বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে ক্লাসিক মহাকাব্যটির স্থান নির্ণয়ে সাহায্য করেছে এই গবেষণা। আমার গবেষণাকর্মের সময়সীমা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। এরপর একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকেই বাংলা ভাষায় এপার বাংলা-ওপার বাংলা মিলিয়ে মহাভারতকেন্দ্রিক প্রায় কুড়িটি উপন্যাস এবং পঁচিশটির মতো ছোটোগল্পের সন্ধান পাওয়া গেছে। মহাভারতের দর্শন, জীবনভাবনা ও তার নানান অনুষঙ্গ কীভাবে বাঙালি জীবনে প্রভাব ফেলেছে তার সার্বিক মূল্যায়ন করতে গেলে উক্ত গল্প-উপন্যাসগুলির ধারাবাহিক পর্যালোচনা প্রয়োজন। পরবর্তীকালের কোনো গবেষক যদি এই বিষয়ে আগ্রহান্বিত হন; সেক্ষেত্রে পূর্বসূরী হিসেবে বর্তমান গবেষণা নিবন্ধটি উত্তর-গবেষককে পথপ্রদর্শন করতে পারবে— এই প্রত্যাশা রাখছি।

গবেষণাপত্রে নির্বাচিত উপন্যাস তালিকা:

(লেখকের নামের আদ্যক্ষর অনুসারে)

গজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৯০৮-১৯৯৪)	‘পাঞ্চজন্য’ (১৯৮৭)
কালকূট/ সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)	‘শাম্ব’ (১৯৭৮), ‘যুদ্ধের শেষ সেনাপতি’ (১৯৮৪), ‘পৃথা’ (১৯৮৬), ‘অন্তিম প্রণয়’ (১৯৮৭)
চিত্ত সিংহ	‘জতুগৃহ’ (১৯৭৬)
জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	‘পিতৃকন্যা’ (১৯৮১)
দীপক চন্দ্র (১৯৩৮-২০১৩)	‘ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ’ (১৯৬১), ‘দ্রৌপদী চিরন্তনী’ (১৯৮২), ‘কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন’ (১৯৮৬), ‘গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী’ (১৯৮৭), ‘এবং অশ্বত্থামা’ (১৯৮৮), ‘তোমারি নাম কর্ণ’ (১৯৮৯), ‘পিতামহ ভীষ্ম’ (১৯৮৯), ‘মহাভারতের শকুনি’ (১৯৯১), কৃষ্ণ অর্জুন সংবাদ’ (১৯৯১) ‘দ্বৈপায়নে দুর্যোধন’ (১৯৯২) ‘সম্রাজ্ঞী কুন্তী’ (১৯৯২)

প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫)	‘পূর্ণাবতার’ (১৯৭২)
বিমল কর (১৯২১-২০০৩)	‘যদুবংশ’ (১৯৬৮), ‘অসময়’ (১৯৭৫), ‘শমীক’ (১৯৭৬), ‘এই বেদনায়, বিষাদে’ (১৯৯৯)
বারীন্দ্রনাথ দাশ	‘শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব’ (১৯৬৮)
মিহির সেনগুপ্ত (১৯৪৬-২০২২)	‘বিদুর’ (১৯৯৬)
শাহ্‌যাদ ফিরদাউস (১৯৫০)	‘ব্যাস’ (১৯৯৩)
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২)	‘দময়ন্তী’ (১৯৭১), ‘শকুন্তলা’ (১৯৮০)
সুবোধকুমার চক্রবর্তী (১৯১৯-১৯৯২)	‘দেবযানী’ (১৩৯২)
হর্ষ দত্ত (১৯৫৫)	‘বিকর্ণ’ (১৯৯৫)

গবেষণাপত্রে নির্বাচিত ছোটোগল্প তালিকা:

(লেখকের নামের আদ্যক্ষর অনুসারে)

অমলেন্দু চক্রবর্তী (১৯৩৪-২০০৯)	'একটি পৌরানিক কাহিনি', 'অধিরথ সূতপুত্র'
আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫)	'ভীষ্ম'
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০-১৯৮৯)	'যযাতি'
গজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৯০৮-১৯৯৪)	'যাজ্ঞসেনী', 'হোমাগ্নিসম্ভবা', 'জরা বাসুদেব', 'গুরুর প্রাপ্য', 'ছটি প্রাণের মূল্য', 'অগ্নির অগ্নিমান্দ্য'
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	'অভিমন্যু'
জ্যোৎস্নাময় ঘোষ (১৯৩৬-২০০৮)	'অক্ষক্রীড়ার ক্যাবিনেট মিশন ও ভাঙা বাংলার বুলা', 'ধৃতরাষ্ট্র'
জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৬-১৯৮৮)	'অহল্যা দ্রৌপদী তারা', 'কর্ণ-কুন্তী কথা'
দীপক চন্দ্র (১৯৩৮-২০১৩)	'যোজনগন্ধা সত্যবতী', 'মাটির মূর্তি'
নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮-২০১৯)	'অম্বোপাখ্যান', 'অভিজ্ঞানদুষ্মন্তম্', 'মুখর নৈঃশব্দ্য'
নবেন্দু ঘোষ (১৯১৭-২০০৭)	'সঞ্জয় উবাচ'
নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫)	'দেবযানী', 'যযাতি', 'যযাতি'
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)	'দুঃশাসন'
পরশুরাম/ রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০)	'পুনর্মিলন', 'তৃতীয় দ্যূতসভা', 'ভরতের ঝুমঝুমি', 'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালি', 'বালখিল্যগণের উৎপত্তি', 'অদলবদল', 'কর্দম মেখলা', 'ধুস্তরী মায়া'
পূর্ণেন্দু পত্রী (১৯৩১-১৯৯৭)	'খাড়ুবেড়িয়ার দ্রৌপদী'
প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)	'মহাভারতে নেই', 'কীচকবধে ঘনাদা', 'ভারতযুদ্ধে পিঁপড়ে', 'কুরুক্ষেত্রে ঘনাদা', 'খাণ্ডবদাহে ঘনাদা',

	‘শান্তিপর্বে ঘনাদা’, ‘ঘনাদার শল্য সমাচার’, ‘আঠারো নয় উনিশ’, ‘জয়দ্রথবধে ঘনাদা’
বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯)	‘শরশয্যা’
বরেন গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩০-২০০১)	‘দ্রৌপদী’, ‘বস্ত্রহরণ’
বাণী বসু (১৯৩৯)	‘পাঞ্চজন্য’
বিমল কর (১৯২১-২০০৩)	‘যযাতি’, ‘যুধিষ্ঠিরের আয়না’, ‘সত্যদাস’
ভগীরথ মিশ্র (১৯৪৭)	‘অভিমন্যু’
মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬)	‘দ্রৌপদী’, ‘ভীষ্মের পিপাসা’, ‘সাঁঝ সকালের মা’
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)	‘দুঃশাসনীয়’, ‘রাঘব মালাকর’
রতন ভট্টাচার্য (১৯৩৩-২০০৬)	‘মহাভারত’, ‘যযাতি’
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)	‘প্রতিহিংসা’, ‘শেষ কথা’
সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫০-২০১৫)	‘আমি মাধবী’
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২)	‘স্বর্গদর্শন’
সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০)	‘ভারতপ্রেমকথা’ (গল্পগ্রন্থ), ‘পরশুরামের কুঠার’, ‘কৌন্তেয়’, ‘জতুগৃহ’

গবেষণাপত্রে নির্বাচিত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ তালিকা:

১. আনন্দ মুখোপাধ্যায়। 'গদ্যে মহাভারত' (সংক্ষেপিত)। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, ডিসেম্বর ২০২১।

২. কালীপ্রসন্ন সিংহ। 'বেদব্যাস বিরচিত কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারত: প্রথম খণ্ড'। রাজ সংস্করণ। ১৪শ সং। কলকাতা, সাহিত্য তীর্থ পাবলিশার্স, মে ২০১৬।

৩. কালীপ্রসন্ন সিংহ। 'বেদব্যাস বিরচিত কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারত: দ্বিতীয় খণ্ড'। রাজ সংস্করণ। ২০তি সং। কলকাতা, সাহিত্য তীর্থ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০২১।

৪. চিত্রা দেব (সম্পা)। 'কবিচন্দ্রের মহাভারত'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, সাহিত্যলোক, মহালয়া ১৩৮৯।

৫. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা)। 'কাশীদাসী মহাভারত : কাশীখণ্ড'। ৭ম মুদ্রণ। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ২০২০।

৬. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা)। 'কাশীদাসী মহাভারত : উত্তর কাশীখণ্ড'। ৫ম মুদ্রণ। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ২০১৯।

৭. পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য। 'মহাভারত ও অন্যান্য'। তানিয়া চক্রবর্তী (সংগ্রহ ও সম্পাদনা)। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, আত্মজা পাবলিশার্স, নভেম্বর ২০১৮।

৮. বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী। 'মহাভারত'। ১০ম মুদ্রণ। কলকাতা, আনন্দ, আগস্ট ২০২২।

৯. রাজশেখর বসু। 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত সারানুবাদ'। ১২শ মুদ্রণ। কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪১৪।

১০. সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'মহাভারত'। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, বিশ্বনাথ রায়(সম্পা)। ১ম আশাদীপ সং। পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা, আশাদীপ, ২০২১।

১১. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্ মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতম্ (দর্শনাচার্য্য শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপসমাখ্যয়া টীকয়া—মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-মহাকবি-পদ্মভূষণেন শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তৎকৃত-বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্) আদিপর্ব্ব ১' । ৪র্থ মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মাঘ ১৪২৬।

১২. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: আদিপর্ব্ব ২'। ২য় (বিশ্ববাণী) সং। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, অগ্রহায়ণ ১৩৮৩।

১৩. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: আদিপর্ব্ব ৩'। ৫ম মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, বৈশাখ ১৪২৮।

১৪. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: আদিপর্ব্ব ৪'। ৫ম মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, বৈশাখ ১৪২৮।

১৫. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: সভাপর্ব্ব ৫'। ৪র্থ মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ভাদ্র ১৪২৭।

১৬. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: বনপর্ব্ব ৬'। ৪র্থ মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মহালয়া ১৪২৫।

১৭. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: বনপর্ব্ব ৭'। ৫ম মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ভাদ্র ১৪২৭।

১৮. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। ‘মহাভারতম্: বনপৰ্ব্ব ৮’। ৪র্থ মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, অক্ষয় তৃতীয়া ১৪২৪।
১৯. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। ‘মহাভারতম্: বনপৰ্ব্ব ৯’। ৫ম মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ভাদ্র ১৪২৭।
২০. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। ‘মহাভারতম্: বনপৰ্ব্ব ১০’। ৫ম মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ভাদ্র ১৪২৭।
২১. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। ‘মহাভারতম্: বনপৰ্ব্ব ১১’। ৫ম মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ভাদ্র ১৪২৭।
২২. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। ‘মহাভারতম্: বিরাটপৰ্ব্ব ১২’। ২য় (বিশ্ববাণী) সং। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, আষাঢ় ১৩৮৫।
২৩. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। ‘মহাভারতম্: উদ্‌যোগপৰ্ব্ব ১৩’। ২য় বিশ্ববাণী সং। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, বৈশাখ ১৩৮৫।
২৪. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। ‘মহাভারতম্: উদ্‌যোগপৰ্ব্ব ১৪’। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মহালয়া ১৪২২।
২৫. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। ‘মহাভারতম্: উদ্‌যোগপৰ্ব্ব ১৫’। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মহালয়া ১৪২২।
২৬. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। ‘মহাভারতম্: উদ্‌যোগপৰ্ব্ব ১৬’। ৫ম সং। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ভাদ্র ১৪২৭।
২৭. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। ‘মহাভারতম্: ভীষ্মপৰ্ব্ব ১৭’। ৫ম মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, বৈশাখ ১৪২৮।
২৮. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। ‘মহাভারতম্: ভীষ্মপৰ্ব্ব ১৮’। ৩য় সং। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, বৈশাখ ১৪২৮।
২৯. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। ‘মহাভারতম্: ভীষ্মপৰ্ব্ব ১৯’। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মহালয়া ১৪২২।
৩০. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। ‘মহাভারতম্: ভীষ্মপৰ্ব্ব ২০’। ২য় (বিশ্ববাণী) সং। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, বৈশাখ ১৩৯০।
৩১. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। ‘মহাভারতম্: দ্রোণপৰ্ব্ব ২১’। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মহালয়া ১৪২২।
৩২. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। ‘মহাভারতম্: দ্রোণপৰ্ব্ব ২২’। ৪র্থ মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, রথযাত্রা ১৪২৬।
৩৩. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। ‘মহাভারতম্: দ্রোণপৰ্ব্ব ২৩’। ২য় (বিশ্ববাণী) সং। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, আষাঢ় ১৩৮৭।
৩৪. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। ‘মহাভারতম্: দ্রোণপৰ্ব্ব ২৪’। ১ম (বিশ্ববাণী) সং। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মাঘ ১৩৮৯।
৩৫. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। ‘মহাভারতম্: দ্রোণপৰ্ব্ব ২৫’। ২য় বিশ্ববাণী সং। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, বৈশাখ ১৩৯০।

৩৬.শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: কর্ণপর্ব্ব ২৬'। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মহালয়া ১৪২২।

৩৭.শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: কর্ণপর্ব্ব ২৭'। ৪র্থ মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, বইমেলা ১৪২৫।

৩৮.শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: শল্যপর্ব্ব ২৮'। ২য় (বিশ্ববাণী) সং। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, আষাঢ় ১৩৮৭।

৩৯.শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: শল্যপর্ব্ব ২৯'। ৫ম মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, বৈশাখ ১৪২৮।

৪০.শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: সৌপ্তিকপর্ব্ব ৩০'। ৫ম মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ভাদ্র ১৪২৭।

৪১. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: স্ত্রীপর্ব্ব ৩১'। ৪র্থ মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, অগ্রহায়ণ ১৪২৬।

৪২.শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: শান্তিপর্ব্ব ৩২'। ২য় (বিশ্ববাণী) সং। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মহালয়া ১৪০০।

৪৩.শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: শান্তিপর্ব্ব ৩৩'। ২য় (বিশ্ববাণী) সং। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, আষাঢ় ১৩৮৭।

৪৪. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: শান্তিপর্ব্ব ৩৪'। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মহালয়া ১৪২২।

৪৫.শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: শান্তিপর্ব্ব ৩৫'। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মহালয়া ১৪২২।

৪৬.শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: শান্তিপর্ব্ব ৩৬'। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মহালয়া ১৪২২।

৪৭.শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: শান্তিপর্ব্ব ৩৭'। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মহালয়া ১৪২২।

৪৮.শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: অনুশাসনপর্ব্ব ৩৮'। ৫ম মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ভাদ্র ১৪২৭।

৪৯.শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: অনুশাসনপর্ব্ব ৩৯'। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মহালয়া ১৪২২।

৫০.শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: অনুশাসনপর্ব্ব ৪০'। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মহালয়া ১৪২২।

৫১. শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: আশ্বমেধিকপর্ব্ব ৪১'। ৪র্থ মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৪২৬।

৫২.শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: আশ্বমেধিকপর্ব্ব ৪২'। ৫ম মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মাঘ ১৪২৬।

৫৩.শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য। 'মহাভারতম্: আশ্রমবাসিকপর্ব্ব-মৌসলপর্ব্ব-মহাপ্রস্থানিকপর্ব্ব-স্বর্গারোহণপর্ব্ব-ভারত সাবিত্রী ৪৩'। ৫ম মুদ্রণ। কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, মাঘ ১৪২৬।

আকর গ্রন্থপঞ্জি:

১. অমলেন্দু চক্রবর্তী। 'অবিরত চেনামুখ'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, আশা প্রকাশনী, নভেম্বর ১৯৭৫।

২. আশাপূর্ণা দেবী। 'পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প'। জন্মশতবার্ষিকী সং। কলকাতা, সাহিত্যম, ২০০৯।

৩. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। 'স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প'। ১ম সং। কলকাতা, মডেল পাবলিশিং হাউস, ১ বৈশাখ ১৩৯৫।

৪. কালকূট। 'কালকূট রচনাসমগ্র ৬'। সাগরময় ঘোষ (সম্পা)। ১ম সং। কলকাতা, মৌসুমী প্রকাশনী, ১৩৬৬।

৫. কালকূট। 'কালকূট রচনাসমগ্র ৮'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, মৌসুমী প্রকাশনী, ফাল্গুন ১৩৯৩।

৬. কালকূট। 'কালকূট রচনাসমগ্র ৯'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, মৌসুমী প্রকাশনী, আশ্বিন ১৩৯৬।

৭. কালিসাধন মুখোপাধ্যায়। 'দ্রৌপদী'। ১ম সং। কলকাতা, তুলি-কলম, জানুয়ারি ২০০১।

৮. গজেন্দ্রকুমার মিত্র। "অগ্নির অগ্নিমান্দ্য"। 'বলাকা'। পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, শুভ শারদোৎসব ১৪২৭।

৯. গজেন্দ্রকুমার মিত্র। 'আকাশের আয়না'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, রবীন্দ্র লাইব্রেরি, মাঘ ১৩৭৯।

১০. গজেন্দ্রকুমার মিত্র। 'পাঞ্চজন্য'। অখণ্ড সং। ৩৮শ মুদ্রণ। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৪২৭।

১১. গজেন্দ্রকুমার মিত্র। "ভীমের শিক্ষা"। 'প্রভাতী'। পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, শুভ মহালয়া ২০২২।

১২. চিত্ত সিংহ। 'জতুগৃহ'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, বিশ্বজ্ঞান, ১৯৭৬।

১৩. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী। 'পিতৃকন্যা'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, ডি.এম লাইব্রেরি, ১৯৮১।

১৪. জ্যোৎস্নাময় ঘোষ। 'জ্যোৎস্নাময় ঘোষের রচনাসমগ্র প্রথম খণ্ড'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, কালধ্বনি, জানুয়ারি ২০১০।

১৫. জ্যোতির্ময়ী দেবী। 'জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন ১'। গৌরকিশোর ঘোষ (সম্পা)। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪।

১৬. ড. দীপক চন্দ্র। 'অমৃতকুম্ভ'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা পুস্তক মেলা, ১৪০২।

১৭. ড. দীপক চন্দ্র। 'পঞ্চমাতৃকা'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩।

১৮. ড. দীপক চন্দ্র। 'পুণ্যের আলো'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০২।

১৯. ড. দীপক চন্দ্র। 'মহাভারতের পাশা'। ২য় সং। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬।

২০. দীপক চন্দ্র। 'যোজনগন্ধা সত্যবতী'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, আশীর্বাদ প্রকাশন, জানুয়ারি ১৯৬১।

২১. দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'গল্পসমগ্র'। অনিশ্চয় চক্রবর্তী (সম্পা)। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, একুশ শতক, ২০০৫।

২২. নবীনচন্দ্র সেন। 'কুরুক্ষেত্র'। সজনীকান্ত দাস (সম্পা)। ৩য় সং। কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, শ্রাবণ ১৪১৫।

২৩. নবীনচন্দ্র সেন। 'প্রভাস'। সজনীকান্ত দাস (সম্পা)। ১ম সং। কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, আষাঢ় ১৩৬৮।

২৪. নবীনচন্দ্র সেন। 'রৈবতক কাব্য'। সজনীকান্ত দাস (সম্পা)। ১ম সং। কলকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ভাদ্র ১৩৭১।

২৫. নবেন্দু ঘোষ। 'গল্পসংগ্রহ'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরি, ১৩৯১।

২৬. নরেন্দ্রনাথ মিত্র। 'গল্পমালা ৭'। ১ম সং। কলকাতা, আনন্দ, জানুয়ারি ২০০৩।

২৭. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। 'গল্পসমগ্র'। অখণ্ড সং। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪২০।

২৮. নীহাররঞ্জন গুপ্ত। "ঘটোৎকচ সংহার"। 'অলকনন্দা'। পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, আশ্বিন ১৪২৪।

২৯. পূর্ণেন্দু পত্রী। "খাড়ুবেড়িয়ার দ্রৌপদী"। 'একালের গল্প'। ১ম প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ রাজ্য কমিটি, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮।

৩০. প্রমথনাথ বিশী। 'পূর্ণাবতার'। ২য় মুদ্রণ। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৮২।

৩১. প্রেমেন্দ্র মিত্র। "জয়দ্রথ বধে ঘনাদা"। 'প্রভাতী'। পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, শুভ মহালয়া ২০২২।

৩২. প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'মহাভারতে নেই'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, আদিত্য প্রকাশালয়, বৈশাখ ১৩৮০।

৩৩. প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'ঘনাদাসমগ্র ২'। ৯ম মুদ্রণ। কলকাতা, আনন্দ, অক্টোবর ২০১৭।

৩৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড সমগ্র সাহিত্য'। যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা)। ১৭শ মুদ্রণ। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৪২০।

৩৫. বনফুল। 'বনফুলের গল্পসমগ্র ১'। ১ম সং। কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১৯৮০।

৩৬. বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। 'গল্পসমগ্র অখণ্ড'। ১ম অখণ্ড সং। কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, আগস্ট ২০১২।

৩৭. বাণী বসু। "পাঞ্চজন্য"। 'নানা স্বাদের গল্প'। ১ম প্রকাশ। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, মাঘ ১৪০৪।

৩৮. বারীন্দ্রনাথ দাশ। 'শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, বাক-সাহিত্য, ১৯৬৮।

৩৯. বিমল কর। 'উপাখ্যানমালা'। ১ম সং। কলকাতা, আনন্দ, জানুয়ারি ১৯৯২।

৪০. ভগীরথ মিশ্র। "অভিমন্যু"। 'একালের গল্প দ্বিতীয় খণ্ড'। ১ম প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ রাজ্য কমিটি, বইমেলা ২০০৬।

৪১. মধুসূদন দত্ত। 'মধুসূদন রচনাবলী'। ক্ষেত্রগুপ্ত (সম্পা)। ৬ষ্ঠ মুদ্রণ। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ২০১২।

৪২. মহাশ্বেতা দেবী। 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্প সংকলন'। ৪র্থ মুদ্রণ। কলকাতা, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০০২।

৪৩. মহাশ্বেতা দেবী। 'মহাশ্বেতা দেবীর পঞ্চাশটি গল্প'। ২য় সং। কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৬।

৪৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'শ্রেষ্ঠ গল্প'। আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা)। পুনর্মুদ্রণ। ঢাকা, অবসর, আগস্ট ২০১১।

৪৫. মিহির সেনগুপ্ত। 'বিদুর'। ১ম সংসদ সং। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ফেব্রুয়ারি ২০২২।

৪৬. রতন ভট্টাচার্য। 'রতন ভট্টাচার্যের গল্প'। ১ম সং। কলকাতা, আনন্দ, জুলাই ১৯৯০।

৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'গল্পগুচ্ছ'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, সিলেকশন, ২০০৯।

৪৮. রাজশেখর বসু। 'পরশুরাম গল্পসমগ্র'। নতুন সং। কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ২০১০।

৪৯. শাহ্‌যাদ ফিরদাউস। 'ব্যাস'। খোয়াবনামা ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা, খোয়াবনামা, সেপ্টেম্বর ২০২২।

৫০. শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী। 'দেবযানী'। ১ম সং। কলকাতা, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ, ১৩৭২।

৫১. সুবোধ ঘোষ। 'ভারতপ্রেমকথা'। ১ম সং। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৬২।

৫২. সুবোধ ঘোষ। 'সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ প্রথম খণ্ড'। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা, প্রাইমা পাবলিকেশনস্, আগস্ট ১৯৯১।

৫৩. হর্ষ দত্ত। 'বিকর্ণ'। ১ম সং। কলকাতা, আনন্দ, নভেম্বর ১৯৯৫।

৫৪. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বৃত্রসংহার কাব্য'। সজনীকান্ত দাস (সম্পা)। ১ম সং। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৬০।

সহায়ক বাংলা গ্রন্থপঞ্জি :

১. আকিমুন রহমান। 'পৌরাণিক পুরুষ'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, গাংচিল, জানুয়ারি ২০১১।

২. অজয় সাহা (সম্পা)। 'আধুনিক বাংলা উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি (১৯৪৭-২০২০)'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, আশাদীপ, সেপ্টেম্বর ২০২০।

৩. অজিতকুমার ঘোষ। 'বাংলা নাটকের ইতিহাস'। ৭ম সংস্করণ। কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৮৫।

৪. অতনু চট্টোপাধ্যায়। 'পর্যালোচনার নিরিখে মহাভারতের উপাখ্যান'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, এডুকেশন ফোরাম, ডিসেম্বর ২০২১।

৫. অনির্বাণ ভট্টাচার্য (সম্পা)। 'মহাভারতে হিংসা'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, আলোচনা চক্র, ফেব্রুয়ারি ২০২২।

৬. অভিজিৎ তরফদার। 'কুরুক্ষেত্রকথা'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০১৩।

৭. অভীক গঙ্গোপাধ্যায়। 'সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা সাহিত্য বিবর্তনে অনুবর্তনে'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, বুকস ওয়ে, ২০১৪।

৮. অমলেশ ভট্টাচার্য। 'মহাভারতের কথা'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, প্রতিভাস, ২০০৯।

৯. অমূল্য কর্মকার। 'মহাভারতের বিচিত্র কথা'। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ৩য় সং। কলকাতা, ভোলানাথ প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০২২।

১০. অলোক রায়। 'উনিশ শতক'। ২য় সংস্করণ। কলকাতা, প্রমা প্রকাশনী, ২০১২।

১১. অলোক রায়। 'বিশ শতক'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, প্রমা প্রকাশনী, ২০১০।

১২. অশ্রুকুমার সিকদার। 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস'। ৪র্থ সং। কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ২০০৮।

১৩. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত'। নতুন পুনর্বিন্যাস সং। কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ২০১৬-২০১৭।

১৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য'। ২য় সং। কলকাতা, বীণা লাইব্রেরী, ২০১৩।

১৫. আবুল ফজল। 'মহাভারতের দেশ'। ১ম প্রকাশ। ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ডিসেম্বর ২০২২।

১৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য। 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস: প্রথম খণ্ড'। ৫ম সং। কলকাতা, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং, ২০০২।

১৭. আহমদ শরীফ। 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য: দ্বিতীয় খণ্ড'। ১ম সং। ঢাকা, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৫।

১৮. ইরাবতী কার্বে। 'যুগান্ত'। অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় (অনু)। তৃতীয় মুদ্রণ। কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১১।

১৯. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। 'সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি'। ৪র্থ সং। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪।

২০. এস. এল. ভৈরাপ্পা। 'পর্ব'। কণিকা বসু, পুষ্পা মিশ্র (অনু)। ৩য় মুদ্রণ। নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৬।

২১. কমল চক্রবর্তী। 'সত্যব্রতী'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স, ১৪২৮।

২২. কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। 'ভারত সংস্কৃতিতে ভগবান কৃষ্ণ'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, সাহিত্যলোক, আগস্ট ১৯৮৯।

২৩. কল্যাণীশঙ্কর ঘটক। 'রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য'। ২য় প্রকাশ। বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০।

২৪. কালীপদ দাস। 'ডার্ক সাইড মহাভারত'। ১ম সং। কলকাতা, মৌসুমী প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭।

২৫. খগেন্দ্রনাথ মিত্র। ‘ছোটদের মহাভারত’। সাহিত্যলোক সং। কলকাতা, সাহিত্যলোক, ফেব্রুয়ারি ২০০২।
২৬. খগেন্দ্রনাথ মিত্র। ‘শতাব্দীর শিশু সাহিত্য’। আকাদেমি সংস্করণ। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯।
২৭. গিরীন্দ্রশেখর বসু। ‘পুরাণপ্রবেশ’। ৫ম সং। কলকাতা, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ২০১৯।
২৮. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত। ‘মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া’। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০১।
২৯. জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘মহাকাব্য ও মৌলবাদ’। পরিবর্ধিত ৩য় সং। পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, এপ্রিল ২০০৯।
৩০. জয়া মিত্র। ‘শৈব্যা কথন’। ১ম সং। কলকাতা, সুপ্রকাশ, জানুয়ারি ২০২২।
৩১. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী। ‘প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার: প্রথম খণ্ড’। ২য় সং। কলকাতা, ডি এম লাইব্রেরি, ২০০৪।
৩২. ড. মুজাহিদ বিল্লাহ ফারুকী। ‘বাংলাদেশের উপন্যাসে পুরাণ ও ইতিহাস’। ১ম প্রকাশ। ঢাকা, ন্যাশনাল পাবলিকেশন, মুজিবজন্মশতবর্ষ, ২০২০-২০২১।
৩৩. ড. দীপক চন্দ্র। ‘সুধাসাগর তীরে’। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৮।
৩৪. ড. সচ্চিদানন্দ দাস। ‘বাংলা সাহিত্যে পুরাণ ও পৌরাণিক কথাসাহিত্য’। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০১৫।
৩৫. ড. লতিফ উদ্দীন। ‘মহাভারতের বাংলা অনুবাদ নিসর্গের স্বরূপ সন্ধান’। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, সেপ্টেম্বর ২০২১।
৩৬. তপোধীর ভট্টাচার্য। ‘উপন্যাসের বিনির্মাণ’। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০।
৩৭. তপোধীর ভট্টাচার্য। ‘ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ’। পরিমার্জিত ২য় সং। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮।
৩৮. তপোধীর ভট্টাচার্য। ‘জাক দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ’। ১ম দে’জ সং। কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৩।
৩৯. তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘পাণ্ডু’। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০২২।
৪০. তিলোত্তমা মজুমদার। ‘অর্জুন ও চারকন্যা’। ৫ম মুদ্রণ। কলকাতা, আনন্দ, মার্চ ২০২২।
৪১. দীপঙ্কর লাহিড়ী। ‘শাশ্বত মহাভারতের পুনর্পাঠ’। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, মনফকিরা, ২০১২।
৪২. দীপ্তি ত্রিপাঠী। ‘আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়’। পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত ১ম দে’জ সংস্করণ। কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৩।
৪৩. দেবীদাস আচার্য। ‘মহাভারতে জনবিদ্রোহের উপাদান’। ১ম সং। কলকাতা, আনন্দ, ২০১৯।
৪৪. দেবীদাস আচার্য। ‘মহাভারতে নিম্নবর্গ’। ১ম সং। কলকাতা, আনন্দ, ২০২২।
৪৫. দেবীদাস আচার্য। ‘মহাভারতে হিংসার রাজনীতি’। ১ম সং। কলকাতা, আনন্দ, ২০২৩।
৪৬. ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। ‘মহাভারতের নারী’। ৭ম মুদ্রণ। কলকাতা, আনন্দ, মার্চ ২০২২।
৪৭. নবনীতা দেবসেন। ‘গল্পসমগ্র ৪’। ২য় সং। কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১।
৪৮. নবনীতা দেবসেন। ‘সীতা থেকে শুরু’। ১২শ মুদ্রণ। কলকাতা, আনন্দ, জুন ২০২২।
৪৯. নিবেদিতা বিশ্বাস। ‘মহাভারতচর্চা: উনিশ শতকের বাংলা অনুবাদে ও অনুষঙ্গে’। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০১৩।
৫০. নিবেদিতা বিশ্বাস। ‘মহাভারত প্রসঙ্গ, প্রসঙ্গান্তর’। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে পাবলিকেশন্স, ২০১৫।
৫১. নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী। ‘কথা অমৃতসমান : ১’। ৪র্থ সং। কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৭।
৫২. নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী। ‘কথা অমৃতসমান : ২’। ৪র্থ সং। কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৭।

৫৩.নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী। 'কথা অমৃতসমান : ৩'। ১ম সং। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬।
৫৪.নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী। 'কথা অমৃতসমান : ৪'। ১ম সং। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬।
৫৫.নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী। 'কথা অমৃতসমান : ৫'। ১ম সং। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯।
৫৬.নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী। 'কথা অমৃতসমান : ৬'। ১ম সং। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০২০।
৫৭.নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী। 'কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌন্তেয়'। ১ম সং। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮।
৫৮.নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী। 'মহাভারতের ছয় প্রবীণ'। ৪র্থ মুদ্রণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৭।
৫৯.নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী। 'মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি'। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা, পত্রলেখা, মার্চ ২০১৬।
৬০.নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী। 'মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ'। ১ম সং। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯১।
৬১. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী। 'মহাভারতের লঘু-গুরু'। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা, পত্রলেখা, আগস্ট ২০১৮।
৬২.পণ্ডিত সুভেন্দুশেখর ভট্টাচার্য। 'পুরাণ কথা'। ১ম প্রকাশ। হুগলি, সিসৃক্ষা, পৌষ ১৪২৭।
৬৩.পরিমলকান্তি সরকার। 'বাঙালীর সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা: উনিশ শতক'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, আশাদীপ, ফেব্রুয়ারি ২০২২।
৬৪. পূর্বা সেনগুপ্ত। 'ইদম্ অমৃতম্'। ১ম সং। কলকাতা, পঞ্চালিকা প্রকাশনী, জুলাই ২০২২।
৬৫.পৃথ্বীরাজ সেন। 'পুরাণ কথায় প্রেম'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, পালক, বইমেলা ২০২২।
৬৬.প্রতিভা বসু। 'মহাভারতের মহারণ্যে'। ৬ষ্ঠ সং। কলকাতা, বিকল্প প্রকাশনী, ২০১০।
৬৭.বাণী বসু। 'পাঞ্চালকন্যা কৃষ্ণা'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮।
৬৮.বাণী বসু সংকলিত। 'বাংলা শিশুসাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী'। ১ম সং। কলকাতা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৯৬২।
৬৯.বাণী বসু। 'সুযোধন-দুর্যোধন'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮।
৭০.বাণী বসু। 'ক্ষত্তা'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭।
৭১. বাণী বসু। 'ক্ষত্রবধূ'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০২০।
৭২.বিমল কুমার থান্দার। 'একালের সাহিত্যে সেকালের রাধাকৃষ্ণ কথা: উনিশ শতক'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, মার্চ ২০১৬।
৭৩.বিমল কুমার থান্দার। 'একালের সাহিত্যে সেকালের রাধাকৃষ্ণ কথা: বিশ শতক'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, এপ্রিল ২০১৭।
৭৪. বিমল সরকার। 'মহাভারতের মহাসাগরে: ১ম খণ্ড'। ২য় সং। কলকাতা, কমলিনী প্রকাশন বিভাগ, জানুয়ারি ২০২০।
৭৫.বিমল সরকার। 'মহাভারতের মহাসাগরে: ২য় খণ্ড'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, কমলিনী প্রকাশন বিভাগ, জানুয়ারি ২০১৯।
৭৬.বিমল সরকার। 'মহাভারতের মহাসাগরে: ৩য় খণ্ড'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, কমলিনী প্রকাশন বিভাগ, জানুয়ারি ২০২১।
৭৭.বুদ্ধদেব বসু। 'অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ'। ৫ম সং। কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ২০১২।
৭৮.বুদ্ধদেব বসু। 'কালসন্ধ্যা'। ১ম সং। কলকাতা, আনন্দ, ১৯৬৯।
৭৯.বুদ্ধদেব বসু। 'মহাভারতের কথা'। ১ম সিগনেট সং। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা, সিগনেট প্রেস, মার্চ ২০২১।
৮০.বুদ্ধদেব বসু। 'সংক্রান্তি, প্রায়শ্চিত্ত, ইক্ষাকু সেন্নিন তিনটি কাব্যনাট্য'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০২।

৮১. ভগবানদাস প্যাটেল সংকলিত। 'ভিল মহাভারত'। জয়া মিত্র (অনু)। ২য় মুদ্রণ। নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ২০২১।
৮২. ভূমি সেনগুপ্ত। 'ভীষ্মের পূর্বজন্ম'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, খোয়াই পাবলিশিং হাউস, ফেব্রুয়ারি ২০২২।
৮৩. মনোজ মিত্র। 'রামায়ণী–মহাভারতী'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ২০০৯।
৮৪. মল্লার চট্টোপাধ্যায়। 'মৃত্যুঞ্জয়ী: যুধিষ্ঠির আর অশ্বত্থামার শেষ সাক্ষাৎকার'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, ধানসিড়ি, জুলাই ২০২২।
৮৫. মল্লিকা সেনগুপ্ত। 'কথামানবী'। ৭ম মুদ্রণ। কলকাতা, আনন্দ, ২০১৪।
৮৬. মাহবুব সাদিক। 'কবিতায় মিথ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ'। ২য় বর্ধিত সং। ঢাকা, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ডিসেম্বর ২০১২।
৮৭. মাহমুদুর রহমান। 'দ্রৌপদী'। ১ম প্রকাশ। ঢাকা, নালন্দা, ফেব্রুয়ারি ২০২২।
৮৮. মাহমুদুর রহমান। 'রাধেয়'। ২য় সং। ঢাকা, নালন্দা, ফেব্রুয়ারি ২০২৩।
৮৯. মাহমুদুর রহমান। 'শকুনি উবাচ'। ১ম প্রকাশ। ঢাকা, নালন্দা, ফেব্রুয়ারি ২০২১।
৯০. মিশু মিলন। 'নাগরী'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, সুপ্রকাশ, ডিসেম্বর ২০২১।
৯১. মিহির সেনগুপ্ত। 'চক্ষুষ্মতী গান্ধারী'। পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত ২য় সং। কলকাতা, সুপ্রকাশ, ডিসেম্ব, ২০২০।
৯২. মিহির সেনগুপ্ত। 'যুদ্ধান্তে'। ১ম সং। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ডিসেম্বর ২০১৫।
৯৩. রত্না ভট্টাচার্য। 'অথ মহাভারত কথা'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, ইতিকথা পাবলিকেশন, বইমেলা ২০২২।
৯৪. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক'। ৩য় সং। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১১।
৯৫. রসিক উপাধ্যায় (সম্পা)। 'পঞ্চম বৈদিক পৌরাণিকা: কল্প পর্ব'। ১ম প্রকাশ। হুগলি, ধী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০২২।
৯৬. শাঁওলী মিত্র। 'ইতিহাস পুরাণ ও আখ্যান'। কারিগর সং। কলকাতা, কারিগর, জানুয়ারি ২০১৮।
৯৭. শাঁওলী মিত্র। 'নাথবতী অনাথবৎ'। ৪র্থ সং। কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০৯।
৯৮. শামিম আহমেদ। 'মহাভারতে গুপ্তহত্যা'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, গাংচিল, অক্টোবর ২০১৪।
৯৯. শামিম আহমেদ। 'মহাভারতে দ্রৌপদী'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, গাংচিল, নভেম্বর ২০১৩।
১০০. শামিম আহমেদ। 'মহাভারতে নাস্তিকতা'। ১ম সং। কলকাতা, সিগনেট প্রেস, জানুয়ারি ২০২০।
১০১. শামিম আহমেদ। 'মহাভারতে বিবাহ'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, গাংচিল, জানুয়ারি ২০১৫।
১০২. শামিম আহমেদ। 'মহাভারতে যৌনতা'। ৪র্থ মুদ্রণ। কলকাতা, গাংচিল, সেপ্টেম্বর ২০২০।
১০৩. শিপ্রা দত্ত। 'চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত পর্ব ১'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, ডি. এম লাইব্রেরি, ১৩৬১।
১০৪. শিপ্রা দত্ত। 'চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত পর্ব ২'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, ডি. এম লাইব্রেরি, ১৩৬৩।
১০৫. শিপ্রা দত্ত। 'চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত পর্ব ৩'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, ডি. এম লাইব্রেরি, ১৯৫৭।
১০৬. শিপ্রা দত্ত। 'চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত পর্ব ৪'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, ডি. এম লাইব্রেরি, ১৯৭৮।
১০৭. শিপ্রা দত্ত। 'চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত পর্ব ৫'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, ডি. এম লাইব্রেরি, ১৩৮৭।
১০৮. শিপ্রা দত্ত। 'চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত পর্ব ৬'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, ডি. এম লাইব্রেরি, ১৩৮৭।
১০৯. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। 'গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য'। কারিগর সং। কলকাতা, কারিগর, ২০১৩।
১১০. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ভারতে মহাভারতে'। ১ম সং। কলকাতা, চার্বাক, জানুয়ারি ২০২২।

১১১. শিবেন্দুশেখর মিশ্র। 'মহাভারত নানা প্রসঙ্গ ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, অমর ভারতী, সেপ্টেম্বর ২০১১।

১১২. শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ। 'মহাভারত ১ম খণ্ড'। ১ম বাংলাদেশ সং। ঢাকা, অভিযান, ২০২০।

১১৩. শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ। 'মহাভারত ২য় খণ্ড'। ৩য় মুদ্রণ। কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৮।

১১৪. শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ। 'মহাভারত ৩য় খণ্ড'। ২য় মুদ্রণ। কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৬।

১১৫. শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ। 'মহাভারত ৪র্থ খণ্ড'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৮।

১১৬. শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ। 'মহাভারত ৫ম খণ্ড'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৯।

১১৭. শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ। 'মহাভারত ৬ষ্ঠ খণ্ড'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স, ২০২০।

১১৮. শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ। 'মহাভারত ৭ম খণ্ড'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স, ১৪২৮।

১১৯. শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ। 'মিথের সাম্রাজ্য সাম্রাজ্যের মহাকাব্য'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স, ২০২১।

১২০. শুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'মহাভারতের নারী'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, লালমাটি, বইমেলা ২০১৮।

১২১. শ্রীভূদেব চৌধুরী। 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার'। ৫ম সংস্করণ। কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ২০১৩-২০১৪।

১২২. শ্রী সুখময় ভট্টাচার্য। 'মহাভারতের চরিতাবলী'। ৪র্থ মুদ্রণ। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪১৩।

১২৩. শ্রী সুখময় ভট্টাচার্য। 'মহাভারতের সমাজ'। ৪র্থ মুদ্রণ। শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, ১৪১৩।

১২৪. সত্যবতী গিরি। 'বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ'। ১ম দে'জ সং। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৭।

১২৫. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'দলিতের পুরাণকথা'। পরিবর্ধিত অনুষ্টুপ সং। কলকাতা, অনুষ্টুপ, জুলাই ২০১৭।

১২৬. সব্যসাচী রায়চৌধুরী। 'প্রেক্ষিত: মহাভারত'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, আশাদীপ, জানুয়ারি ২০২০।

১২৭. সমীরণ দাস। 'একলব্যের আঙুল'। ১ম প্রকাশ। হুগলী, প্ল্যাটফর্ম প্রকাশন, জানুয়ারি ২০২৩।

১২৮. সম্পদ বারিক (নিখাদ বাঙালি)। 'ফাজিলের মহাভারত'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, খোয়াই পাবলিশিং হাউস, ফেব্রুয়ারি ২০২২।

১২৯. সুকুমারী ভট্টাচার্য। 'পুরাণ ও অন্যান্য'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, মিলেমিশে, ২০১২।

১৩০. সুকুমারী ভট্টাচার্য। 'প্রবন্ধ সংগ্রহ ২'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, গাংচিল, ২০১২।

১৩১. সুকুমারী ভট্টাচার্য। 'রামায়ণ ও মহাভারত আনুপাতিক জনপ্রিয়তা'। ৪র্থ মুদ্রণ। কলকাতা, ক্যাম্প, অক্টোবর ২০১৮।

১৩২. সুচেতনা সেন কুমার। 'সৌবল শকুনি'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, একলব্য প্রকাশন, ২০২০।

১৩৩. সুমিতা চক্রবর্তী। 'ছোটগল্পের বিষয়-আশয়'। ৪র্থ মুদ্রণ। কলকাতা, পুস্তক বিপণি, মার্চ ২০২১।

১৩৪. সৈকত বসু। 'বিবর্তনের ধারায় মহাভারত: গোষ্ঠী, যুদ্ধ, কাব্য'। ১ম সং। কলকাতা, সিগনেট প্রেস, এপ্রিল ২০২৩।

১৩৫. সোহারাব হোসেন। 'দ্বিতীয় দ্রৌপদী'। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১২।

১৩৬. সৌরভ মুখোপাধ্যায়। 'দৈবাদিষ্ট'। ১ম সং। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, মাঘ ১৪২৯।

১৩৭. সৌরভ মুখোপাধ্যায়। 'প্রথম প্রবাহ'। ১ম মিত্র ও ঘোষ সং। কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্রাবণ ১৪২৯।

১৩৮. সৌরভ মুখোপাধ্যায়। 'যুগ-সম্ভাবিনী'। ২য় মুদ্রণ। হুগলি, অন্তরীপ পাবলিকেশন, জানুয়ারি ২০২৩।

১৩৯. স্বরূপকুমার ধবল। ‘অভিশপ্ত মহাভারত’। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, বাণীশিল্প, জন্মাষ্টমী ১৪২৮।
১৪০. স্বাগতা গুপ্ত। ‘বিমল কর ও কালকূটের উপন্যাসে মহাভারতের প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ’। ১ম প্রকাশ। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২।
১৪১. স্বামী তথাগতনন্দ। ‘মহাভারত–কথা’। ১ম সং। কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ডিসেম্বর ১৯৯৮।
১৪২. স্বামী নির্ম্মলানন্দ। ‘সচিত্র মহাভারতের গল্পগুচ্ছ’। ১ম সং। কলকাতা, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, পৌষ ১৪০০।
১৪৩. হরিশংকর জলদাস। ‘কর্ণ’। ১ম প্রকাশ। ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২৩।
১৪৪. হরিশংকর জলদাস। ‘কুন্তীর বস্ত্রহরণ’। ১ম প্রকাশ। ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২১।
১৪৫. হরিশংকর জলদাস। ‘দুর্যোধন’। ৪র্থ মুদ্রণ। ঢাকা, কথাপ্রকাশ, এপ্রিল ২০২২।
১৪৬. হরিশংকর জলদাস। ‘মৎস্যগন্ধা’। ২য় সং। ৩য় মুদ্রণ। ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২২।

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি (নির্বাচিত) :

1. Alf Hiltebeitel. 'Rethinking the Mahabharata'. 1st Ed. Chicago, The University of Chicago Press, 2001.
2. Arindam Chakrabarti & Shivaji Bandyopadhyay (ed). 'Mahabharata Now: Narration, Aesthetics, Ethics'. 1st Ed. Delhi, Routledge, 2014.
3. Arindam Chakrabarti. "Meat and Morality in the Mahabharata". 'Studies in Humanities and Social Sciences'. Vol III, No. 2. Shimla, Indian Institute of Advanced Studies, 1996.
4. M.H. Abrams and Groffey Galt Harpham. 'A Glossary of Literary Terms'. 1st Ed. New Delhi, Cengage Learning, 2016.
5. M.N. Dutt. 'Mahabharata (Sanskrit Text and English Translation)'. Vol I [Adi Parva, Sabha Parva]. Edited and Revised with Introduction by Dr. Ishwar Chandra Sharma, Dr. O.N. Bimali. 3rd Reprint Ed. Delhi, Parimal Publications, 2013.
6. M.N. Dutt. 'Mahabharata (Sanskrit Text and English Translation)'. Vol II [Vana Parva]. Edited and Revised with Introduction by Dr. Ishwar Chandra Sharma, Dr. O.N. Bimali. 3rd Reprint Ed. Delhi, Parimal Publications, 2013.
7. M.N. Dutt. 'Mahabharata (Sanskrit Text and English Translation)'. Vol III [Virata Parva, Udyoga Parva]. Edited and Revised with Introduction by Dr. Ishwar Chandra Sharma, Dr. O.N. Bimali. 3rd Reprint Ed. Delhi, Parimal Publications, 2013.
8. M.N. Dutt. 'Mahabharata (Sanskrit Text and English Translation)'. Vol IV [Bhisma Parva]. Edited and Revised with Introduction by Dr. Ishwar Chandra Sharma, Dr. O.N. Bimali. 3rd Reprint Ed. Delhi, Parimal Publications, 2013.
9. M.N. Dutt. 'Mahabharata (Sanskrit Text and English Translation)'. Vol V [Drona Parva]. Edited and Revised with Introduction by Dr. Ishwar Chandra Sharma, Dr. O.N. Bimali. 3rd Reprint Ed. Delhi, Parimal Publications, 2013.
10. M.N. Dutt. 'Mahabharata (Sanskrit Text and English Translation)'. Vol VI [Karna Parva, Salya Parva, Sauptika Parva, Stri Parva]. Edited and Revised with Introduction by Dr. Ishwar Chandra Sharma, Dr. O.N. Bimali. 3rd Reprint Ed. Delhi, Parimal Publications, 2013.
11. M.N. Dutt. 'Mahabharata (Sanskrit Text and English Translation)'. Vol VII [Santi Parva]. Edited and Revised with Introduction by Dr. Ishwar Chandra Sharma, Dr. O.N. Bimali. 3rd Reprint Ed. Delhi, Parimal Publications, 2013.
12. M.N. Dutt. 'Mahabharata (Sanskrit Text and English Translation)'. Vol VIII [Santi Parva]. Edited and Revised with Introduction by Dr. Ishwar Chandra Sharma, Dr. O.N. Bimali. 3rd Reprint Ed. Delhi, Parimal Publications, 2013.

13. M.N. Dutt. ‘Mahabharata (Sanskrit Text and English Translation)’. Vol IX [Anusasana Parva, Asvamedhika Parva, Asramavasika Parva, Mausala Parva, Mahaprasthanika Parva, Svargarohana Parva]. Edited and Revised with Introduction by Dr. Ishwar Chandra Sharma, Dr. O.N. Bimali. 3rd Reprint Ed. Delhi, Parimal Publications, 2013.
14. R.N.Dandekar (Ed). ‘The Mahabharata Revisited’. 1st ed. New Delhi, Sahitya Akademi, 2011.
15. Shivaji Bandyopadhyay. ‘Three Essays on the Mahabharata’. 1st Ed. Kolkata, Orient Blackswan, 2016.
16. TRS Sharma (Ed). ‘Reflections and Variations on the Mahabharata’. 1st Ed. New Delhi, Sahitya Akademi, 2013.

সহায়ক পত্রিকাপঞ্জি:

১. অতনুশাসন মুখোপাধ্যায় (সম্পা)। 'দশদিশি পত্রিকা বিষয় আকর গ্রন্থাদি এবং বাংলা ভাষায় চর্চা : দ্বিতীয় ভাগ'। খণ্ড ১০, সংখ্যা ১ এবং ২ একত্রে। মার্চ ২০২২।

২. আদিত্য সেন, বিকাশ বিশ্বাস (সম্পা)। 'উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস: রজত জয়ন্তী সংকলন'। বর্ষ ২৫, ২য় ও ৩য় সংখ্যা। ডিসেম্বর ২০১৯–জানুয়ারি ২০২০।

৩. উৎপল ঝা, নির্মলকুমার নাগ (সম্পা)। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'। বর্ষ ১১৯, ১–৪ সংখ্যা ১৪১৯। জানুয়ারি ২০১৫।

৪. খোকন কুমার বাগ (সম্পা)। 'অন্তর্মুখ বাংলা গবেষণা পত্রিকা'। পর্ব ৯, সংখ্যা ৪। এপ্রিল–জুন ২০২০।

৫. জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা)। 'রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা'। অষ্টাদশ সংখ্যা। মার্চ ২০০১।

৬. ড. জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায় (সম্পা)। 'রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা'। ষড়বিংশতিতম সংখ্যা। নভেম্বর ২০১২।

৭. ড. বিকাশকান্তি মিদ্যা (সম্পা)। 'রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা'। পঞ্চবিংশতিতম সংখ্যা। জুন ২০০৮।

৮. ড. সনৎকুমার নস্কর, ড. দীপঙ্কর মল্লিক (সম্পা)। 'সন্ধান বিষয়: বাংলা সাহিত্যে পুনর্নির্মাণ ও বিনির্মাণ'। ১ম খণ্ড। বর্ষ ১২, সংখ্যা ১। জানুয়ারি ২০২৪।

৯. তাপস ভৌমিক (সম্পা)। 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা রামায়ণ সংখ্যা'। সেপ্টেম্বর–ডিসেম্বর ১৯৯৮।

১০. তাপস ভৌমিক (সম্পা)। 'কোরক সাহিত্য পত্রিকা বিষয়: মহাভারত চর্চা'। শারদ সংখ্যা। কলকাতা, কোরক, ২০১৪।

১১. তাপসী দাস (সম্পা)। 'সময় তোমাকে পত্রিকা বিষয়: আধুনিক বাংলা উপন্যাসে মিথ'। বর্ষ ৯, সংখ্যা ৪। ২০১৪–২০১৫।

১২. দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক (সম্পা)। 'স্বরান্তর'। বর্ষ ৩, সংখ্যা ৬। জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৭।

১৩. দেবব্রত সূর (সম্পা)। 'এবং আমরা: পুরাণ সংখ্যা'। বর্ষ ৮, সংখ্যা ১। জানুয়ারি ২০২২।

১৪. প্রশান্ত মাজী (সম্পা)। 'প্রতিবিম্ব বিশেষ গদ্য সংখ্যা'। দ্বিতীয় পর্যায় সংকলন। ৭ মে, ২০১০।

১৫. সুদর্শন খাটুয়া (সম্পা)। 'দিঘলপত্র'। বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ১১। ফেব্রুয়ারি ২০২২।

১৬. সুমন রাণা (সম্পা)। 'জাগরী সাহিত্য পত্রিকা বিষয়: রামায়ণ মহাভারতচর্চা'। বর্ষ ৩, সংখ্যা ১। জুন ২০১০।

১৭. সোমনাথ দাস (সম্পা)। 'সময় তোমাকে পত্রিকা বিষয়: আধুনিক বাংলা ছোটোগল্পে মিথ'। বর্ষ ৫, সংখ্যা ৭। নভেম্বর ২০১১।

১৮. শঙ্করী দাস (সম্পা)। 'সময় তোমাকে পত্রিকা বিষয়: বাংলা কবিতার মিথ'। বর্ষ ১২, বিশেষ সংখ্যা। ২০১৮।

১৯. শহীদ ইকবাল (সম্পা)। 'চিহ্ন ক্রোড়পত্র মহাভারত পুনর্পাঠ'। বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৩৪। ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

সহায়ক অভিধান:

১. আকাদেমি বানান উপসমিতি (সম্পা)। 'আকাদেমি বানান অভিধান'। ৬ষ্ঠ সং। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৮।

২. পবিত্র সরকার। 'ব্যাবহারিক বাংলা বানান-অভিধান'। ১ম সং। কলকাতা, লতিকা প্রকাশনী, বইমেলা ২০১৮।

৩. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস। 'সংসদ বাংলা অভিধান'। ১৫শ মুদ্রণ। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, এপ্রিল ২০১০।

৪. সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত। 'পৌরাণিক অভিধান'। ১২শ সং। কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কার্তিক ১৪২৭।

৫. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (প্রথম খণ্ড)। ১ম প্রকাশ। নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ১৩৪০–১৩৫৩।

৬. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (দ্বিতীয় খণ্ড)। ৬ষ্ঠ মুদ্রণ। নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৪।

সহায়ক ওয়েবসাইট:

1. https://www.jstore.org/stable/23341407?read
2. https://granthagara.com/genres/literature/page/28/
3. https://dokumen.pub/
4. https://ignca.gov.in/